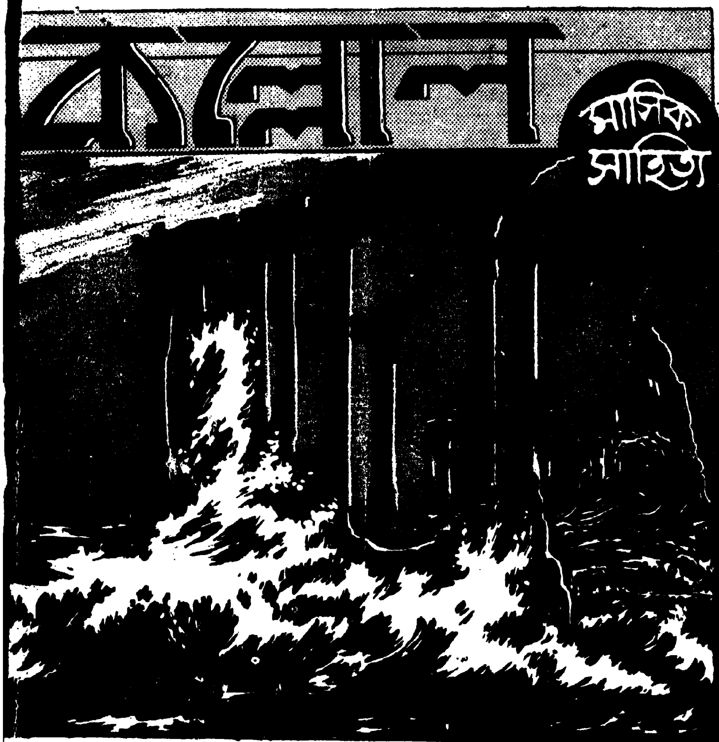
২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা]

[১৩৩১ সাল



সম্পাদক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ।

সহ-সম্পাদক—শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ।

প্রা

বার্ষিক ৩।০

ফটোর সরঞ্জাম

সহস্র রকমের,

আমাদের কাছেও তাই আছে। আমাদের কাছ থেকে আপনার এ সম্বন্ধে যা কিছু দরকার, কিনে দেখুন। বহুদিনের ঘরে ঠাসা মাল সস্তায় বিক্রী করা আমাদের রীতি নয়। ঠিক দাম নিয়ে ঠিক্ জিনিষই দেবো।

ব্রোমাইড্ এন্‌লার্জমেণ্ট

—মাউণ্ট করা ও ভাল ফিনিস্—

সাইজ্	১০ × ১০	...	...	...	৮্
„	১৫ × ১২	...	...	...	১২্
„	২৩ × ১৭	...	...	...	২০্

এ ছাড়া ল্যাণ্টারন্ স্লাইড্, ল্যাণ্ডস্কেপ্, বাইরে বা আপনাদের বাড়ীতে বিবাহ ও উৎসবাদিতে ফটো তোলা প্রভৃতির মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখ্লেই আমরা ডাকে পাঠিয়ে দেবো।

খেলার সরঞ্জাম

ইন্‌ডোর বা আউট্‌ডোর

সব রকমই আমাদের কাছে আছে। ক্যাটা-লগের জন্য আপনার ঠিকানাটা জানালেই, আমরা আপনাকে পাঠিয়ে দেবো।

দি মিড্‌ল্যাণ্ড স্পোর্টস্ হাউস্

৪৩।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সূচী

১।	কবি-নাস্তিক ...	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	৭৯৫
২।	মুক্তি ...	শ্রীঅচিন্ত্য সেন-গুপ্ত	৮০০
৩।	বসন্ত-বেদনা ...	শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ	৮০৮
৪।	অন্ধকার ...	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন-গুপ্ত	৮২৬
৫।	বাংলা সাহিত্যের কথা ...	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	৮৩০
৬।	মৃত্যুঞ্জয় ...	শ্রীযুবনাশ্ব	৮৩৫
৭।	বন্ধ্যা ...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী	৮৩৯
৮।	দুই দিন ...	শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়	৮৪১
৯।	মানসী ...	শ্রীদেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৪৬
১০।	পান্থ-বীণা ...	শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়	৮৪৮
১১।	বিদ্যা-বণিক ...	* * *	৮৫৫
১২।	অবস্থান্তর ...	শ্রীনৃসিংহদাসী দেবী	৮৬২
১২।	প্রতীক্ষায় ...	শ্রীসুবোধ দাশ-গুপ্ত	৮৬৯
১৪।	রম্যাঁ রলাঁ ...	শ্রীকালিদাস নাগ	৮৭৬
১৫।	পথের আলো ...	শ্রীবিজয় সেন-গুপ্ত	৮৮১
১৬।	নিবেদন ...	শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ	৮৮৯



গন্ধমাধুর্য্যে ও স্থায়িত্বগুণে

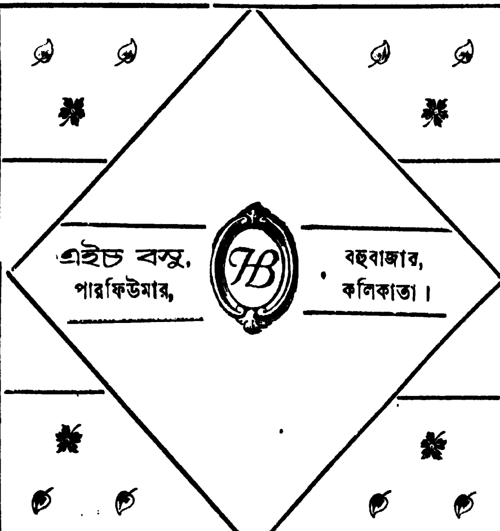
দেলখোস

অননুকরণীয়।

এই বিশেষ গুণেই আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবৎ দেলখোসের এত আদর, এত প্রতিপত্তি, এত বহুল প্রচলন।

দেলখোস রয়েল – ৪৷০ দেলখোস ষ্ট্যাণ্ডার্ড—১৷৷০

দে ল খো স



কো কো লী ন

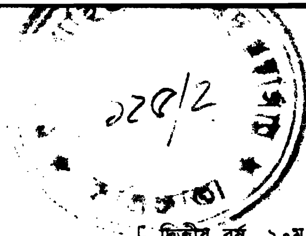
সুন্দর মুখের লাবণ্য রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে,
মুখ ও ত্বক কোমল ও শুভ্র করিতে আপনাদিগকে

কোকোলীন সোপ

মাখিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ব্যবহার করিলে বুঝিতে পারিবেন এই সাবান গুণে ও গন্ধে বিলাতী সাবানকেও পরাজিত করিয়াছে।

চন্দন—১৲
বকুল—১৲
গ্লিসারিন—১৲
হোয়াইট রোজ—১৷০
টার্কিস বাথ—২৷৷০





মাঘ, ১৩৩১ সাল]   [দ্বিতীয় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

কল্লোল



কবি-নাস্তিক

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

এই ভুবনের মধুর দিনের পথিক যত,
আস্‌ল যারা
হাস্‌ল যারা
ক্ষণেক ভালবাসল যারা,
আজকে তারা সন্ধ্যা তোমার
পাকা সোনার
গলার হারে,
গগন পারে
যে-কথাটি গেল থুয়ে,
কপোল ছুঁয়ে
গেল চলে
যাহা বলে,

হায়রে হায়,
হারিয়ে যায়
সকল কথা আসন্ন ঐ অন্ধকারে!
আর যারা সব
বইল বোঝা, সইল ব্যথা,
মনের কথা কইল না ;
ফুলের তরী বাইল শুধু, ফলের কড়ি চাইল না ;
নীড়েতে পাখ্ পুড়্‌ল যাদের আকাশে হায় উড়্‌ল না—
ঘুর্‌ল না ;
তাদেরও আজ দিবা শেষে
ভালবেসে,
জড়িয়ে বুকে মুছিয়ে আঁখি
অশ্রু-জলে অধর রাখি,
ডাক্‌বে না কেউ হায়রে হায়!
জানি, জানি, সন্ধ্যারাণি, দিনের বাণী সব বৃথায়!
ধূলা সে যে ধূলাই শুধু
পরশ-পাথর নাই রে নাই।
মিথ্যা বোঝা, মিথ্যা খোঁজা
বৃথা ওরে সব যোঝা-ই
মরমে যে মার খেয়েছে
মিথ্যা যে তার সব ওঝাই!
বুকের ভিতর যা থাকে থাক্
ঢেকেই তা রাখ্
ওষ্ঠে প্রিয়ার ভণ্ডামি নাই, নাই পেয়ালায় বুজরুকি,
পরকালের পুঁথি ফেলে, আয় রে হতাশ, আয় দুখী,
আয় রে আয়
দিন যে যায়!
উপবাসী প্রাণ যে চায়
বিপুল নিদারুণ ক্ষুধায়।
যথের কড়ি আগ্‌লে আছিস্ মোক্ষ আশায় মূর্খ কে ?
অর্ঘ্য দে।

এই দেহ তোর দেবতা শুধু,
দিন দুয়েকের স্বর্গ রে!
অর্ঘ্য দে।
নর-দেহের চেয়ে মূর্খ, মোক্ষ নয় মহার্ঘ রে!
অর্ঘ্য দে।
মৃত্যু শাসায়, শুন্‌তে কি পাস্?
দেখ্‌তে কি পাস্, শ্মশান পাতা সকল ঠাঁই,
বিশ্ব জুড়ে চিরটা কাল কালের হাতের নেই কামাই?
ওরে অন্ধ, ওরে হতাশ!
লুট্‌ ক'রে নে যেথায় যা পাস্
আকাশ বাতাস,
প্রেমের প্রকাশ,
নারীর দেহে রূপের বিকাশ,
যেথায় যা পাস্।

ভিখারী তুই আছিস্ ভুখা,
শিকারী সুখ নেয় লুটে,
এ কিরে তোর মনের বিকার—
রইবি খুশী চিরকুটে?
হাঁক উঠে
মুখ ফুটে
মোক্ষ-মোহের ডোর টুটে',
"এই জীবন মোর সাধন
স্বর্গ মোর এই ভুবন!"

দুখ যে চায়, দুখ যে পায়,
আর যে সুখের পিছনে ধায়,
দিনের শেষে সব সমান, সব সমান!
পুঁথির পাতায় ধাপ্পাবাজি পরকালের সব প্রমাণ।
ডাক্‌ছে কবি—আয়রে আয়
তিলে, তিলে, প্রাণ-পেয়ালায়
চুমুক দেবার সময় যে যায়!

সময় যে যায়—সময় যে যায়, বাজছে কালের ডঙ্কা রে,
সকল সুখের পাছে আছে সমাপ্তিরই শঙ্কারে !
শিবের সাথে শ্বস্‌ছে রে সব,
সৃষ্টি সাথে ধ্বংসোৎসব
কালভৈরব হুঙ্কারে।
যৌবনেরও মউ-বনে সব মউ-মাছিদের মর্ম্মরে
শুন্‌ছি বাজায় বিসর্জ্জনি কঙ্কালেরা পঞ্জরে ;
বাজায় ফুলে বাজায় পাতায়
পাখীর পাখায় লাজুক লতায়,
সুখে, আশায়, ভালবাসায়
সব ভরসায়
বাজায়, বাজায় কেবল বাজায় !
—বসন্তেরি রঙিন খাতায়
রঙের সাথে কালো কালি-ই লিখ্‌ছে শমন পাতায় পাতায়।
ওরে ভাই—
চোখের জলের সময় যে নাই !
রূপের মেয়াদ দু'দিন মোটে
দু'দিন মেয়াদ যৌবনের ;
প্রিয়ার ঠোঁটের গুল্‌বাগে ভাই
ইজারা যে দুই দিনের !
ঠিকানা নেই ঠিকানা নেই
আশার ফানুষ কখন ফাঁসে ;
জীবন স্বপন ভাঙেরে তোর
মহাকালের অট্টহাসে!
ভাব্‌বি কি আর, কর্‌বি বিচার
বৃথা কি আর খাট্‌বি বেগার ?
কালকে প্রিয়ার মুখে পাবি
হয়ত চিহ্ন বলি-রেখার !
আজ দরজায়
তাই ত কবি ডাক্ দিয়ে যায়—

ফাগুন ফুরায়—
আগুন জুড়ায় !
মধু-মাসের মহোৎসবে দস্যু হ'য়ে লুট্‌বি কে আয় ।
ছিনিয়ে নেবার সাহস যে চাই—
বিনিয়ে কাঁদিস্ কার ভরসায় ?

বন্ধদ্বার অন্ধকারে
কুঁড়ির প্রাকারে
স্ফুটন-আশায় কাঁপে অস্ফুট প্রসূন ।

'সে কথে'



মুক্তি



—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

প্রথম অঙ্ক

[ফাল্গুনের সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় এখনও গ্যাস্ জ্বলিতে সুরু হয় নাই। প্রাচীরের মাথায় হাট বসাইয়া কাকগুলি মহলা বেশ জমাইয়া তুলিয়াছে। একটি ভাঙা বাড়ীর একতলার ছাদে দেওয়ালের রেলিঙের কাছে একটি যুবক ও তাহার ডান পাশে একটি তরুণী দাঁড়াইয়া ছিল। তরুণীটির পরণে রঙিন একখানি শাড়ী, মাথায় শিথিল একটি ঘোম্‌টা, সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদুর-রেখা, হাতে সোনার আভরণ,—বয়সে সতেরো আঠারো হইবে, নাম মুকুল। যুবকটির দোহারা চেহারা, পরণে খদ্দরের একটা পাঞ্জাবী, চোখে একটা মোটা ফ্রেমের চশমা, বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের কম হইবে না, নাম হিমাংশু। এম. এ. পাশ করিয়া মার্চেণ্ট আফিসে কাজ করিতেছে। যুবকের হাতে তরুণীর একখানি পুষ্ট শিথিল হাত, সন্ধ্যার একটু কিরণ চুড়িগুলিতে ঝিকিমিকি করিতেছে, বাতাসে মাথার ঘোমটার আড়াল হইতে প্রচুর কালো চুল যুবকটির কাঁধের উপর খেলা করিতেছে, বুকের আঁচলটা এলো হইয়া রেলিঙের ধুলার উপর লুটাইতেছে। তাহারা পরস্পরের আরো একটু কাছে আগাইয়া আসিল।]

মুকুল। এ আমার স্বপ্নাতীত মনে হচ্ছে! আমি এ-আনন্দ বইতে পার্‌ছি না—

হিমাংশু। মুকুল! (হাতখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।)

মুকুল। এই ম্লান ধূসর সন্ধ্যা কি অপরূপ লাগ্‌ছে চোখে! ঐ একটা ভিখারিণী, ঐ গাছের পাতার ঝিরি-ঝিরি, এই মেদুর স্নিগ্ধ আকাশ!—যদি তোমাকে না পেতাম! (দুই চোখে জল ভরিয়া আসিল।)

হিমাংশু। তোমার হাতখানি কি ঠাণ্ডা! তোমার চুলের গন্ধটি নিশ্বাসে এসে লাগ্‌ছে। কোনোদিন ত এমন মধুর ক'রে কাঁদি নি মুকুল!

[দুই জনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইতেছিল না। আব্ছা অন্ধকারে কয়েকটা তারা জাগিয়া উঠিয়াছে, মই কাঁধে বাতি-ওয়ালা চলিয়াছে, পাখীর কলরব আর বেশী শুনা যায় না।]

মুকুল। ওরা সব আমাকে সাজাচ্ছিল, চন্দন অগুরু আল্‌তা শাড়ী অলঙ্কার—কোন সমারোহেরই আর শেষ ছিল না। সমস্ত সজ্জা ভার মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, দম যেন বন্ধ হয়ে আস্‌ছে! এত আলো, জঁাক্-জমক, আনন্দ সমস্ত বিষ মনে হচ্ছিল . . . ভাব্‌তে পার্‌ছি না আর! কি চমৎকার অপরূপ এই পৃথিবী! মাছিটা কি মিষ্ট গুন্‌গুন্ কর্‌ছে! . . .

হিমাংশু। (মুকুলের আঙুলগুলি লইয়া খেলা করিতে করিতে) কিন্তু আমি তা জান্‌তাম—

মুকুল। (আয়ত চোখ দুইটি হিমাংশুর মুখের পানে তুলিয়া) জান্‌তে?

হিমাংশু। হাঁ, মোটে তিন দিন আগে জান্‌তাম। জান্‌তাম তুমি আমার ছাড়া আর কারুর—(হাতখানি আবার বুকের উপর চাপিয়া ধরিল)

মুকুল। মুখ-চন্দ্রিকার সময় একবার মুখের দিকে চাইলাম। ভাব্‌লাম দেখি, কে সে ধূমকেতুর মতো আমার খুশীর বাগান পুড়িয়ে দিল?

হিমাংশু। (উৎসুক কণ্ঠে) কি দেখ্‌লে?

মুকুল। কিছুই দেখ্‌লাম না। তিনি আমার মুখের দিকে চাইলেন না।

হিমাংশু। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) এদেরই বলে মানুষ, না মুকুল?

মুকুল। (জলভরা চোখে) মানুষ?—না-না দেবতা। রাত্রে খালি ইচ্ছে হচ্ছিল, উঠে ওঁকে প্রণাম করি। কিন্তু তিনি এত দূরে শুয়ে রয়েছিলেন! . . .

হিমাংশু। কোন কথা বলে নি?—

মুকুল। (কতগুলি চুল দিয়া হিমাংশুর ডান হাতের মণি-বন্ধটি জড়াইতে জড়াইতে) বলেছেন।

হিমাংশু। কি বল্‌লে?

মুকুল। বল্‌লেন, 'আপনাকে আমি মুক্তি দিতে এসেছি . . . আমাকে আপনি ক্ষমা করুন।'

হিমাংশু। তারপর?

মুকুল। (ঘোমটা পড়িয়া গিয়াছিল, মাথায় উঠাইয়া দিয়া) আমি কিছু বুঝ্‌লুম না। আপনি সম্বোধনটা কানে কি-রকম শোনাল! একটু আশ্চর্য্য হলুম।

হিমাংশু। ব্যথিত হলে না ?

মুকুল। কেন ?—

হিমাংশু। (আবছা একটু হাসিয়া) বিংশ-শতাব্দীর শিক্ষিত ছেলে, বাসর-রাতে স্ত্রীকে আপনি বলে সম্বোধন করেছে . . .

মুকুল। (দুষ্টামির সুরে) যাও! তখন লোকটার ওপর আমার ভারী ঘৃণা হচ্ছিল।

হিমাংশু। (গম্ভীর সুরে) অসিতকে প্রণাম করেছ ?

মুকুল। যাবার সময় প্রণাম ক'রে যাব।—আচ্ছা, উনি কোথায় ?

হিমাংশু। নীচে, পড়ছে।

মুকুল। এখানে যদি এসে পড়েন ?—

হিমাংশু। পাগল! আমাদের এখন যে সে মুক্তি দিয়েছে . . .

মুকুল। (মিষ্ট হাসিয়া হিমাংশুর আঙুলের আঙটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে) তুমি . . .

হিমাংশু। তার পর তুমি কি বল্লে ?

মুকুল। উনি বল্লেন, এই অনুষ্ঠান, এই সামাজিক আচারের কিছু মূল্য নেই। আপনার ভয় নেই, আমি আপনার সত্যের অমর্য্যাদা করব না।

হিমাংশু। সন্ধ্যাতারাটা আমাদের দিকে কি করুণ চোখে চাইছে! . . . তুমি কি বল্লে ?

মুকুল। আমার কাছে সমস্ত রহস্য লাগছিল। উনি বল্লেন—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার ওপর আমার কোন দাবী নেই—থাকতে পারে না। (দুই চোখ জলে ছলছল্ করিয়া উঠিল।)

হিমাংশু। কি সুশীতল স্নিগ্ধ একটি অন্ধকার আমাদের বেষ্টন ক'রে ধরেছে! মুকুল—

মুকুল। উনি বল্লেন, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন, বৃথা উপবাস করায় আপনাকে ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমি কাল বাড়ী পৌঁছেই হিমাংশুর হাতে আপনাকে সঁপে দেব।' . . . সত্যিই এ স্বপ্ন!—নয় ?

হিমাংশু। অসিত যদি এমন উদার না হত!—

মুকুল। (হিমাংশুর বাহুর উপর মুখ লুকাইয়া) না না, সে চিন্তা আর ক'রোনা। কি মধুর তৃপ্তি এ! আমরা দুই সমাজহীন ঘর-ছাড়া ছন্ন-ছাড়া পথিক!

হিমাংশু। একটা পাখী অন্ধকারে দুই ডানা মেলে উধাও হয়ে উড়ে চলেছে!

মুকুল। চল, অসিতবাবুকে প্রণাম ক'রে আসি। আজকে হয় ত তিনি ছেড়ে দেবেন না।

হিমাংশু। মনে পড়ে মুকুল, একদিন এম্নি পালিয়ে যাবার মতলব করেছিলুম? সব ভেস্তে গেল। কি শক্ত লোহার আগল তোমার বাড়ীর! ... হাঁ, আজ রাত্রেই যাব। এখানকার চাকরী ছেড়ে দিয়েছি, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে একটা নিয়োগ-পত্র এসেছে; চল, বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু অসিতের সাহায্য চাই এ বাড়ী থেকে নির্ব্বিঘ্নে বেরিয়ে যেতে।--অসিত, বন্ধু, দেবতা! ...

[তাহারা আবার পাশাপাশি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। আকাশের অগণিত চোখ মিটি-মিটি করিতেছে। কেহ কিছু না বলিলেও দুই জন পরস্পরের উৎসুক দুইখানি মুখ বাড়াইয়া দিয়া ব্যগ্র অধর-সঙ্গমে আসিয়া স্থির হইল। গীর্জ্জার ঘড়িতে আটটা বাজিতেছে। অসিতের বাবা অক্ষয়বাবু পিছনের দরজা দিয়া ছাদে আসিতেছিলেন। এই দুই তরুণ-তরুণীর অভিনব প্রেম-পরিবেশন দেখিয়া খানিকক্ষণ 'থ' হইয়া থাকিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন। হিমাংশু ও মুকুল দুইজনে চোখের জল মুছিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। নীচে রাস্তা দিয়া পাড়ার একটা ছেলে বাঁশের বাঁশীতে ফুঁ দিতে-দিতে চলিয়াছে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[সেই রাত্রি। নীচে বসিবার ঘরে ঈজি চেয়ারে শুইয়া একটি যুবক একখানি ইংরাজি মাসিক-পত্রিকার পাতা উল্টাইতেছিল। পাশের টেবিলের উপর অয়েল-ক্লথ্ পাতা, তাহার উপরে একটা বড় লণ্ঠন, চারিপাশে রাশীকৃত কাগজ-পত্র পুঁথি খাতা বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে। ঘরের সমস্তগুলি জানালা খোলা, বাতাসে লণ্ঠনের আলোটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। যুবকটির বলিষ্ঠ দেহ, উন্নত ললাট ও দীপ্ত চক্ষু দেখিলেই সম্ভ্রম করিতে ইচ্ছা হয়। কলিকাতার কোন কলেজে প্রফেসারি করে ও মাঝে মাঝে আদালতে ঢুঁ মারিয়া আসে। মাথায় কোঁকড়ানো চুলগুলি হাওয়ায় দোল খাইতেছে, মুখখানিতে একটি অপরূপ শান্তি মাখানো। বয়স সাতাশের বেশী হইবে না। হঠাৎ অক্ষয়বাবু চটি-জুতার

শব্দ করিতে করিতে এক রকম দৌড়াইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সে চমকাইয়া উঠিল।]

অক্ষয়। এ-কি কাণ্ড অসিত ?—

অসিত। (চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কি হয়েছে বাবা ?

অক্ষয়। (ভাঙা-ভাঙা গলায়) ছাদে হিমাংশু আর বৌ-মা . . . ছি ছি ! এমন কুলটাকে পুত্রবধূ করেছি ! (মাথায় হাত দিয়া মেঝের দিকে চাহিয়া রহিলেন।)

অসিত। (ক্ষণকাল মেঝের পানে চাহিয়া থাকিয়া, শান্ত ধীরভাবে) কি করেছে বাবা ?

অক্ষয়। (অসিতের গলার স্বরে বিস্মিত হইয়া) কি করেছে ? হিমাংশুকে বলি, এই কি বন্ধুত্বের প্রতিদান ? ছি ছি ! তার বন্ধুর পরিণীতা পত্নীর অঙ্গ স্পর্শ করা ! তাকে তুমি এক্ষুণি দারোয়ান দিয়ে চাবুকে বাড়ীর বা'র ক'রে দাও অসিত। আর আমি ঐ চরিত্রহীনা বধূকেও ঘরে স্থান দিচ্ছি নে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি,—স্বচক্ষে—(বৃদ্ধ রাগে ফুলিতে লাগিলেন।)

অসিত। (হাতের মাসিকপত্রটা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া গলার স্বরকে সংযত শান্ত করিয়া) ওরা এমন কিছু অন্যায় ত করে নি বাবা—

অক্ষয়। (বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে) এঁ্যা ? অন্যায় নয় ?—

অসিত। (শান্তস্বরে) না।

অক্ষয়। (শাসাইয়া) তুমি এ-কথা বলছ ?—স্বামী হয়ে ?

অসিত। আমি তার স্বামী নই।

[অক্ষয়বাবুর কাছে সমস্ত ধাঁধাঁ লাগিতে লাগিল। তিনি ইহার কিছুই সমাধান করিতে পারিলেন না। তিনি একটা চেয়ারে ধুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, অসিতও সামনের একটা চেয়ারে বসিল। অক্ষয়বাবুর ঠোঁট কাঁপিতেছিল, একবার তাঁহার চোখের দিকে চাহিয়া অসিত চোখ নামাইয়া লইল।]

অক্ষয়। তুমি কি পাগল হয়েছ অসিত ?

অসিত। না বাবা, পাগল হই নি।

অক্ষয়। তবে ?—

অসিত। তবুও আমি মুকুলের স্বামী নই।

অক্ষয়। (কর্কশকণ্ঠে) স্বামী নও ? এ কি-রকম কথা ? কাল বিয়ে ক'রে

বউ ঘরে আন্‌লে, আজ তুমি তার স্বামী নও ?—পাগলের মুখ ছাড়া এমন আজ্‌গুবি কথা আর কার মুখ দিয়ে বেরোয় ? দাঁড়াও, আমিই এর একটা হেস্ত-নেস্ত কর্‌ছি। [বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভিতরের দরজা দিয়া উপরে যাইবেন, অসিত তাঁহাকে বাধা দিল।]

অসিত। যাবেন না, সমস্ত কথা শুনুন। ওদের বাধা দেবার অন্যায় অধিকার আমার বা আপনার কারুর নেই।

অক্ষয়। কেন ?

অসিত। কেন না, কালকের বিবাহকে আমি অস্বীকার করি। ঐ প্রাণহীন আচারের দাবীতে আমরা কোনো অধিকারই দেখাতে পারিনে।

অক্ষয়। তার মানে ?—

অসিত। তার মানে,—আপনি অত অস্থির হবেন না, সব স্থির হয়ে শুনুন—তার মানে, যে-বিবাহে দুইটি অপরিচিত প্রাণীর স্থূল-দেহের মিলন ঘটিয়ে দেওয়া হল, সে-মিলন আমার চোখে নেহাৎ অগৌরব ও ক্ষুদ্রতার বিষয় ব'লে মনে হয়। মুখের মন্ত্রের গুরুত্বকে আমি স্বীকার করি নে। আপনি ত জানেন, আমার কোন দিনই বিয়ে করার মত্‌ ছিল না। হঠাৎ—

অক্ষয়। (তাড়াতাড়ি) তবে হঠাৎ বিয়ে করার ঝোঁক্‌ হল কেন ?—

অসিত। (শান্তস্বরে) বিয়ে করলুম, মুকুলকে মুক্তি দিতে। আপনি ত জানেন, আমাদের বাংলার সমাজে তরুণ-তরুণীর বিয়ে খুব অল্পই পূর্ব্বরাগের থেকে হ'য়ে থাকে। যে ক'টা হয় বা হতে চায়, তাদের দাবিয়ে রাখা অন্যায়—অমানুষিকতা, পাপ।

অক্ষয়। (চঞ্চল হইয়া) তুমি এ-সব কি বল্‌লে অসিত ?—

অসিত। ওরা পরস্পরকে ভালবাসে, পেতে চায়, পেলে সুখী হবে।

[একটা দমকা হাওয়া আসিয়া পাখীগুলি নাড়িয়া দিয়া গেল, রজনী-গন্ধার একটু গন্ধ বহিয়া বাতাস, পিতা ও পুত্রের ললাট স্পর্শ করিল, পথবাসী কোন্‌ পথিকের করুণ বাঁশীর সুর বাজিয়া চলিয়াছে]

অক্ষয়। (বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে) তবে তোমার বিয়ে করার কি দরকার ছিল ?

অসিত। (মাসিকপত্রটা দুই হাতে মোচ্‌ড়াইতে-মোচ্‌ড়াইতে) বল্‌লাম যে, এই হীন সমাজকে ঠকিয়ে মুকুলকে মুক্তি দিতে। নইলে বিয়ে আমি কক্‌খনো করতাম না।

অক্ষয়। মুকুলকে মুক্তি দেবার ভার তোমার ওপর পড়্‌ল কেন?—হিমাংশুই ত তাকে নিজে বিয়ে করতে পারত?

অসিত। (একটু হাসিয়া) বিয়ে করতে পারত বটে, কিন্তু মুকুলের বাবা বিয়ে দিত না।

অক্ষয়। কেন?

অসিত। হিমাংশুরা কায়স্থ।

অক্ষয়! (চমকাইয়া উঠিয়া) কায়স্থ? ছি—ছি! বামুনের সঙ্গে কায়েতের পরিণয়? ছি ছি ছি! একেবারে—

অসিত। বাবা!

[ডাক শুনিয়া অক্ষয়বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। একবার অসিতের সুন্দর দীপ্ত মুখের পানে চাহিলেন, কোন কথা বলিতে পারিলেন না। হাওয়ায় আর একটা কি ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিল। একটা নিদ্-হারা তারা আনন্দে কাঁপিতেছে।]

অক্ষয়। (কপালে হাত রাখিয়া) আমি এ-সব আয়ত্ত করতে পারছি না!

অসিত। (দৃঢ়স্বরে) অনুদার সঙ্কীর্ণ সমাজকে আঘাত দেওয়া চাই। আঘাত না পেলে সে আর বাঁচ্‌বে না।

[অক্ষয়বাবু অসিতের মুখের পানে চাহিয়া চোখ নামাইয়া লইলেন]

অক্ষয়। বল—

অসিত। সমাজের কাছে মন্ত্রই হল মূল্যবান, হৃদয় নয়। গোত্র হল মিলনের মাপকাঠি, প্রেম নয়। আপনি একবার ভাবুন। মানুষ ত শুক্‌নো পুঁথি-কেতাবের জীব নয় বাবা, তার দেহ যে রক্তে-মাংসে গড়া, সেখানে যে সব মাটি!

অক্ষয়। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারছি নে, তর্ক করবার ক্ষমতা আমার চ'লে গেছে।

অসিত। ভেবেছিলুম, বিয়ে কোন দিন করব না জীবনে। হঠাৎ আপনারা একদিন আমার মত্‌ বদ্‌লে যেতে ভারী খুশী হয়েছিলেন। কেন মত্‌ বদ্‌লেছিলাম?—

অক্ষয়। বুঝেছি।

অসিত। ভাব্‌লুম, বন্ধুর জীবন নষ্ট হতে দেব না। শুধু মূল্যহীন কতকগুলি কথার জালে মুকুলকে টেনে এনে হিমাংশুর হাতে উপহার দিব। আমি করেওছি তাই। অনেক আগেই ওদের বিয়ে হয়েছিল, আর সেই-ই সত্যিকারের বিয়ে, আর

এটা একটা ভূয়ো জুয়ো খেলা। (হাসিয়া) আমি মন্ত্র কিছু শুনিওনি, আওড়াইও নি। সমস্ত জিনিষকে সুন্দর ক'রে দেখ্‌বার একটা মনীষা আছে বাবা। ওদেরও সুন্দর ক'রে দেখ্‌তে শিখুন।—

[কথা অস্পষ্ট হইয়া আসিল। অন্ধকার মা'র স্নেহের মত নিবিড় হইয়া রহিয়াছে। অক্ষয়বাবু অসিতের একখানি হাত টানিয়া লইয়া তাহাতে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অসিতের হারা মা'র মুখখানি চাঁদের আলোর মত তাঁহার চোখে ভাসিয়া উঠিল, চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। তারাগুলি আনন্দ-গানের ফিন্‌কির মত দপ্‌-দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। ঘর-ছাড়া একটা পাপিয়া ব্যথা-বিদীর্ণ কণ্ঠে 'পিউ কাঁহা' ডাক ছাড়িয়া আকাশে মিশাইয়া গেল। গীর্জ্জার ঘড়িটা এই সুন্দর সুষুপ্তির হৃদয়ের শব্দ করিতে লাগিল—টং টং টং।]

. . . নগরের ছন্দহীন বিপুলতার মাঝে মানুষের মনের একটা রূপ ও রূপক একসঙ্গে আমি দেখ্‌তে পাই—মানুষের মনের মত জটিল ও অপরূপ, এক ধারে দুর্ব্বল আর এক ধারে উচ্ছৃঙ্খল শক্তিমান।

"বাড়ী বদল'

বসন্ত-বেদনা

—শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ।

অল্প কয়েক ঘণ্টার আড়া-আড়িতে জোয়ান দু'টি ভাই যখন মারা গেল, ধনঞ্জয় বৈরাগীর মনে হল, তার শরীর থেকে দু'টি অঙ্গ যেন কে খসিয়ে নিল! এর বেদনার তীব্রতায় যখন সে জ্ঞানশূন্য, তখন তার বুকের কল্‌জেটাও গেল ছিঁড়ে, স্ত্রী-রূপসীও শেষ-নিশ্বাস ফেল্‌ল! এ ত মরণ নয়, এ যে ভোজবাজী! দুঃখের চেয়ে আশ্চর্য্যটাই বেশী মনে লাগে।

গরীব দুঃখীর প্রতি দেবতার যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দান—স্বাস্থ্য, তা এই পরিবারের সকলের শরীর এবং মনে অটুট ছিল। দুঃখ-দৈন্য হয় ত ছিল অনেক; কিন্তু শোক?—সে ত জানা ছিল না! কি বিষাক্ত তার দংশন, কি ভীষণ তার জ্বালা!

কলে যারা কাজ করে, মাহিনা পাবার দিন তাদের ঘরে সাধারণত যেন পর্ব্ব লেগে যায়। সমস্ত মাসের কড়া-কড়ি, অর্দ্ধাশন এবং পরিশ্রম, ঐ একটি দিনের পান-ভোজন এবং আমোদ-আহ্লাদের ভিতর দিয়ে যেন সার্থক ক'রে তুল্‌তে চায় তারা। একটি দিনের আমীর-ই কর্‌তে গিয়ে সমস্ত মাসটি যে তাদের ফকীর-ই গ্রহণ করতে হয়, তাতে তাদের অসন্তোষ নেই।

এমনি একটি মাহিনা-পাওয়ার দিন রাত্রে, প্রচলিত প্রথা অনুসারে ধনঞ্জয়ের ঘরে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনটা কিছু জেয়াদা-ই হয়েছিল এবং এই জেয়াদা কথাটাই সবার মনে সেদিন গভীর তৃপ্তি ছেয়ে দিয়ে ছিল।

রাত তখন একটু গভীর হয়েছে সবাই হাসি মুখে শু'তে গেল। কিন্তু তিনটি প্রাণী শয্যা থেকে চীৎকার ক'রে জেগে উঠ্‌ল—মরণ বেদনা বুকে নিয়ে, প্রায়, একই সঙ্গে . . . ভোর হ'তে তখনও অনেক দেরী!

হাতে পায়ে ধ'রে, সাধ্যমত অর্থ দিয়ে যে ডাক্তারকে ধনঞ্জয় ডেকে আন্‌ল তিনি বল্‌লেন—খাবারের সঙ্গে বিষ মিশেছে—

বিষ? কি সর্ব্বনাশ! কে মিশাল?—

ডাক্তার বল্‌লেন—যে পাত্রে রান্না হয়েছে, সম্ভবত সেইটেই খারাপ।

ধনঞ্জয় বল্‌ল—তা হ'লে আমরা সবাই ত খেয়েছি; আমাদের হ'ল না কেন ?—

কিন্তু এই 'কেন'র উত্তর শোন্‌বার পূর্ব্বে ধনঞ্জয়ের ছোট ভাই ধনুষ্টঙ্কারগ্রস্ত মানুষের মত বেঁকে-চুরে, দাঁতে দাঁতে চেপে বিকৃত কণ্ঠে ডাক্‌ল—দাদা একবার আয়—

তার কাছে গিয়ে তার বুকে হাত রাখ্‌তেই ধনঞ্জয়ের মেজ ভাইটি শ্বাস-রুদ্ধ মানুষের মত গুম্‌রে উঠ্‌ল—মা গো—'এবং ঠিক এই সঙ্গেই আর একটি অতি ক্ষীণ শব্দ ধনঞ্জয়ের কানে এল—ওগো—

ডাক্তার ওষুধ দিল কিন্তু সে ওষুধ কারো গলা দিয়ে নাম্‌ল না !

ধনঞ্জয়ের কেমন সব যেন গোল-মাল হয়ে গেল ! তিনটি মরণাহত মানুষকে নিয়ে সে যে কি কর্‌বে তার কিছুই যেন সে ভেবে পাচ্ছিল না !

ঘরের বাইরে, দাওয়ায়, ধনঞ্জয়ের মেয়েটি জেগে উঠে ঘরের ভিতরকার ঐ দৃশ্য দেখে আছাড়-পিছাড় খাচ্ছিল। তার চীৎকারে উঠানে পাড়ার লোক এসে জড়ো হ'ল, কিন্তু তাকে জিগ্‌গেস ক'রে কোনই কিনারা কেউ পেল না। দু'এক-জন ক'রে ঘরের ভিতরে এসে সবাই দেখ্‌ল—পাশা-পাশি তিনটি মানুষ শুয়ে আছে, আর তাদের মাথার কাছে ব'সে ধনঞ্জয় তাদের কপালে মুখে বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে! অন্য কিছুর প্রতিই তার খেয়াল নেই; আর ধনঞ্জয়ের স্ত্রী, রূপসীর পায়ের ওপর মাথা চেপে একটা ছেলে পড়ে আছে, মাঝে মাঝে কান্নার বেগে তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে! তার দিকে চোখ পড়্‌তেই ধনঞ্জয়ের যেন চেতনা ফিরে এল। সে ভাঙা গলায় ডেকে বল্‌ল—গৌর, আমার কাছ্‌কে আয়—'

ছেলেটি চাপা গলায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল—মাগো-মা-মা—

মৃত মানুষদের জন্যে শোক প্রকাশ কর্‌বার কেউ আর ঘরে ছিল না, তবু পাড়ার মানুষের চোখের জল ঝর্‌ল। মানুষ মানুষের কাছ থেকে বিদায় নেয় কিন্তু বিদায় দেওয়া, সে কি মানুষের সাধ্যে আছে ? সহ্য তারা করে, সে শুধু উপায় নেই বলেই

* * * *

সন্ধ্যাবেলা শ্মশান থেকে ফিরে ধনঞ্জয় তার নিজের ঘরখানাকে যেন চিন্‌তেই পার্‌ল না। আতঙ্কে তার সর্ব্ব শরীর শিউরে উঠ্‌ল; ঐ নিস্তব্ধ, অন্ধকার ঘর এমন বীভৎস রূপ নিয়ে তার চোখে ফুটে উঠ্‌ল যে, সে আর এগিয়ে আস্‌তে পার্‌ল না, উঠানের এককোণে জড়-সড় হয়ে বসে পড়্‌ল।

প্রতিবেশিনী ক্ষ্যান্ত-পিসি, মানুষের দুঃখে শোকে আনন্দে কাজে কর্ম্মে সবার আগে এসে দাঁড়ায়। সবাই তাকে ধনঞ্জয়ের কাছে গিয়ে তাকে বোঝাতে বলাতে, পিসি বল্‌ল—দু'শ' মড়া নে' বসে একলা রাত জাগ্‌তে প্যারি বাপু, কিন্তুক অমন গুম্‌-খাওয়া নোক দেক্‌লে আমার হাত পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যায়—

কিন্তু সাহস না হ'লেই বা চলে কি ক'রে? ধনঞ্জয়ের কাছে এসে কান্নাভেজা ভাঙা গলা শক্ত ক'রে পিসি বল্‌ল—বলি ধনা, তোর আক্কেলটা কি? এক-রত্তি মেয়েটা সকাল থেকে ডা-পিট্টতে নাগ্‌ল, এক ফোঁটা জল পেটে পড়্‌ল না, আর তুই হাতী-হেন মিন্‌ষে বসে রইলি?—তোর দোষে মরেচে ওরা?—ভগোমান কেড়ে নে'চে, তুই কি কর্‌বি?—এই ত আমি, এক কুড়ি বয়েসের সময় ভাতার-পুতের মাতা খেয়ে, পিরথিমির সব্বস্তি পেটে পুরে বসে আচি।—চোক নেই, দেক্‌তে পাস্‌ নি? দোরে দোরে ভিকে মেগে খাই।—পেটের জ্বালা বড় জ্বালা রে ধনা, খেতে হবেই, আজ না হয় কাল। নে ওঠ্‌, আমি রেঁদে রেকেচি, মেয়েটাকে খাওয়াবি চ'।

ধনঞ্জয় কি যেন বল্‌তে চেষ্টা কর্‌ল কিন্তু পার্‌ল না, উঠ্‌তেও তার ইচ্ছে কর্‌ল না, সে যেমন ছিল তেম্‌নিই বসে রইল। পিসি বল্‌ল—তবু বসে রইলি? ওটাকেও শেষ না ক'রে ছাড়্‌বি নি নাকি?

ধনঞ্জয় এবার ধীরে ধীরে উঠে এসে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিল। পাড়ার দু'একজন যারা উপস্থিত ছিল, তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌ল—যাক্‌, আর ভয় নেই, এবার সাম্‌লে নে'চে।

ধনঞ্জয় একবার চারিদিকে তাকিয়ে বল্‌ল—গৌরকে দেক্‌চ নি যে পিসি, সে কোতায়?

পিসি বল্‌ল—কে জানে, হাড়্‌হাবাতে কোতা ম'ত্তে গেচে! কোন্‌ যমের বাড়ী আর যাবে? পড়ে আচে কোতাও ঘাড়-মোড় গুঁজে; পেটের জ্বালা ধর্‌লেই উঠে আস্‌বে'খন্‌।—রাক্কোস! তিন বচোর বয়েসে বাপ-মা খেয়ে নতুন ক'রে মা-বাপ পেলে, তাও পেটে পুরে নিশ্চিন্দি হ'ল!

ধনঞ্জয় চোখ মুছে বল্‌ল—ওকে কড়া-কতা বলিস্‌নি পিসি, রূপসী ওকে পেটের ছেলের মতন দেক্‌ত, তার মনে কষ্ট হবে।

কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও পিসি সে-রাত্রে গৌরকে বার কর্‌তে পার্‌ল না। পরের দিনও ধনঞ্জয় অনেক খোঁজ করেও তার কোন উদ্দেশ পেল না! সবাই বল্‌ল, সে কোতাও চলে গেচে।

ধনঞ্জয় বুঝ্‌ল, রূপসাকে সে যে মা বলে ডাকৃত, তার মধ্যে কতখানি সত্য ছিল। মা নেই, তাই এই ঘরের সমস্তই তার চোখে শূন্য হয়ে গেছে; এ-ঘর তার ভাল লাগ্‌ল না।

পিসি বল্‌ল—নেমোখারাম—'

ধনঞ্জয় বল্‌ল—না-না; ও-কথা বলিস্‌ নি পিসি, আমি কি আর রূপসীর মত ওকে যত্ন ক'ত্তে পাত্তুম?

২

রাজার দেশে তখন সবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, তাই প্রজার দেশের যত পাটের কল, চটের কল, লোহা-লকড়ের কার্‌খানা সমস্ততেই গোলা বারুদ বন্দুকের কল-কব্‌জা প্রভৃতি মানুষ-মার্‌বার হাতিয়ার অবিশ্রান্ত ভাবে মানুষ গ'ড়ে চলেছে,—এই সব অস্ত্র-শস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে চালান্‌ যায়। মিস্ত্রিদের পরিশ্রমের শেষ নেই। কয়েক ঘণ্টা মাত্র ছুটি নিয়ে দিন রাত্রি সকলে খেটে চলেছে। ধনঞ্জয়, কাশীপুরের গোলা-বারুদের কারখানার একজন প্রধান মিস্ত্রি। তার ভাই দু'টিও তার সঙ্গে কাজ করত। আজ সে একা।

সেদিন কাজ কর্‌তে কর্‌তে তার হাসি পেল। যে মানুষকে বাঁচাবার জন্যে তার আগ্রহের অন্ত ছিল না, সেই মানুষেরই ধ্বংসের জন্যে সে সাহায্য ক'রে চলেছে! ইচ্ছে হ'ল—এ-কাজ ছেড়ে দেয় কিন্তু দিল না, একান্ত নির্ব্বিকার ভাবেই সে দিনের পর দিন কাজ কর্‌তে লাগ্‌ল।

যুদ্ধ যারা করে, তারাও বোধ হয় এই সব মিস্ত্রিদের মতই নির্ব্বিকার। যে ছুরি তৈরী হয়ে তাদের হাতে এসেছে, সেটাকে শত্রুপক্ষের বুকে বসিয়ে দেওয়াই যেন তার কাজ। ছুরি মার্‌তে হবে, এইটুকুই তার ভাব্‌বার অধিকার আছে। ফলাফল, জয়-পরাজয়, মৃত্যু—সে ভাব্‌ছে আর একজন।

খাটুতে খাটুতে মিস্ত্রিদের হাত যখন অবশ হয়ে আসে, তাদের পরিশ্রান্ত দেহ-মনকে নাড়া দিয়ে ধনঞ্জয় বলে—ভাই সব, তোদের হাত ঢিলে চল্‌লে তাদের হাতও বন্ধ হয়ে যাবে—কলের একটা চাকা না ঘুর্‌লে সমস্ত কারখানাটাই থেমে যায়—তোদের হাতেই তাদের মরন-বাঁচন কাঠি—'

মিস্ত্রিরা আবার নবীন উৎসাহে কাজ আরম্ভ করে। ধনঞ্জয় ভাবে, যে গোলা হাতে ক'রে ছাড়্‌লুম সাম্‌নের দিকে, তা ঘুরে এসে কখন কেমন ক'রে নিজেরই বুকে লাগে কে জানে? ...

অসাবধানে কাজ কর্‌বার সময় একদিন একটা গোলা ফেটে একটা দেওয়ালের

সঙ্গে কয়েকজন মানুষ উড়ে গেল! সবাই দেখ্‌ল, মানুষের শক্তির চেয়ে মানুষের জিঘাংসা-বৃত্তিটা কত প্রবল! সহ-কর্ম্মীদের মৃত্যুতে দুঃখের চেয়ে তাদের আশ্চর্য্য লাগ্‌ল বেশী। আকাশের বজ্রকে যেন ঐটুকু একটা লৌহার আবরণের মধ্যে তারা ধরে রেখেছিল!

খবরের কাগজে খবর আসে—আজ এত সহস্র শত্রু সৈন্য ধ্বংস হয়েছে . . . আজ এতগুলি শত্রুদের গ্রাম দখলে এসেছে . . . ধনঞ্জয় ভাবে—আমার গেছে চারটি বন্ধু, আমার গেছে একখানি ঘর।

শেষ রাত্রে ধনঞ্জয় ঘরে ফেরে, খানিকটা ঘুমিয়ে নেয়, একটু বেলা হলে সে ওঠে, ঘরের কাজ-কর্ম্ম করে, সুরভিকে খাওয়ায়, নিজে খায় তার পর আবার বারোটার মধ্যে কাজে যায়।

ক্ষ্যান্ত-পিসি, পাড়ার ছোট-বড় সবারই পিসি। সুরভিও তাকে পিসি বলে; ক্ষ্যান্তরও তা'তে আপত্তি দেখা যায় না। ধনঞ্জয় কাজে বেরিয়ে গেল, সে সুরভিকে নিজের কাছে নিয়ে যায়, রাতে নিজের কাছেই রাখে, সকালে ফিরিয়ে দিয়ে যায়।

পাড়ার লোক বলে—তুই একটা বে' কর্ মিস্তিরি; কার্‌খানার খাটুনি খেটে ঘর-সংসার দেকা আর ক'দ্দিন পার্‌বি? মেয়েটারও অযত্ন হ'চ্চে। বলিস্ ত একটি ডাগর দেকে মেয়ে আমরা দেকি—'

ধনঞ্জয় হাসে।

মানুষ ছাড়ে না, বলে—বে' না করিস্ কাউকে রাক্, সে সব দেকুক্ শুনুক্—'

ধনঞ্জয় শান্তভাবে বলে—রূপ্‌সীর বিচেনাটা আর কেউ এসে দকোল করবে, এইটে ভেবেই গৌরটা আমায় ছেড়ে গেচে।

মানুষ বিরক্ত হয়, বলে—কোতাকার কে, কি ভাব্‌লে না ভাব্‌লে তাই ভেবে তুই সব্বস্ব জলাঞ্জলি দিবি?—

ধনঞ্জয় উত্তর দেয় না, কাজের অছিলায় উঠে যায়।

এমনি ক'রেই দু'টি বছর কেটে গেল। সুরভি এখন দশ পেরিয়ে এগারোয় পা দিয়েছে। গরীবের ঘরে এরই মধ্যে অনেক বিষয় শিখ্‌তে হয়।—'নোকের' সাম্‌নে 'সমিহ' ক'রে চলা-ফেরা, ঢেঁকিতে পা-দেওয়া, চাল-ডাল ঝাড়া, বাসন মাজা, ঘর নিকানো—ক্ষ্যান্ত-পিসি এরই মধ্যে এমন কত কাজ তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছে। ভারী-ভারী জলভরা কলসী কেমন ক'রে তুলিয়ে-তুলিয়ে মাটি থেকে হাঁটুর ওপরি এবং সেখান থেকে কোমরে এনে ধর্‌তে হয়, সুরভির তা অজানা নেই,

এমন কি বে' হলে শ্বশুড়-বাড়ীতে কেমন ক'রে থাক্‌তে হয় তাও সুরভি জানে। দিনে দিনে তার শরীরে রূপসীর সমস্তই যেন ফুটে উঠ্‌ছিল।

কিন্তু ধনঞ্জয়ের কোন পরিবর্ত্তন হ'ল না। সে আজও তেম্‌নি ভাবে দিন কাটায়। খেয়ালের মধ্যে—গৌরের ছোট-বেলাকার দোলাই, পিরানগুলি কাঠের প্যাঁট্‌রা থেকে বার ক'রে রোদে দেওয়া, ধূলো ঝাড়া, আবার পাট ক'রে তুলে রাখা।

গৌর যখন তার কাছে ছিল, তখন সে যে ঠিক তাকে নিজের ছেলের মত ভালবাস্‌ত তা বলা যায় না। রূপসী যখন তাকে তার বাপের-বাড়ীর দেশ থেকে নিয়ে আসে তখন ধনঞ্জয় একটু আশ্চর্য্য এবং বিরক্তও হ'য়েছিল। কিন্তু রূপসী যখন বল্‌ল—ও 'মকরের' ছেলে, ত্রি-সংসারে ওর আর কেউ নেই, শুধু 'ভগোমান' ছাড়া—মানুষ হয়ে ঐ একরত্তি ছেলেকে শুধু তেনার দয়ার ওপরই ফেলে রেকে দিতে কি মানুষ পারে?—ও যদি আমারই হ'ত, তুই কি নিতিস্‌ না? ফেলে দিতিস্‌?—

ধনঞ্জয় আর আপত্তি করে নি। রূপসীর কোন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন দিন সে কোন কাজ করে নি, পারে না। গৌরকে সে রাখ্‌ল।—কিন্তু ভালবাসল সেই দিন, যে দিন রূপসীর পায়ের ওপর পড়ে গৌর মা—মা ব'লে কাঁদ্‌ছিল, আর যে রূপসী গৌরের ডাকে সাড়া না দিয়ে থাক্‌তে পারে নি, সে-ই যখন উত্তর দিল না, গৌরের প্রতি মমতায় ধনঞ্জয়ের বুক ভরে উঠেছিল।

তিন বছরের ছেলেটি কোলে ক'রে রূপসী যখন তাকে আদর কর্‌ত; চোখে কাজল পরাত, ধনঞ্জয়ের মন্দ লাগ্‌ত না। ধনঞ্জয়ের দুই ভাই প্রথম থেকেই ত ছেলেটাকে 'চট্‌কে-মট্‌কে' এমন তালিম ক'রে তুলেছিল যে, কাকাদের কাছে সে সব সময় থাক্‌ত। গৌরের প্রতি কাকাদের এই 'ন্যেওট' ভাবটা রূপসীর ভাল লাগ্‌ত। ও তার নিজের হ'লে ত কাকারা অমনি ক'রেই আদর কর্‌ত—?

গৌরের বয়স হল যখন আট, তখন সুরভি রূপসীর কোলে এল। অত ছোট মেয়েকে আদর ক'রে, কাকারা বা বাপ বেশী সুবিধা পেত না, কিন্তু গৌর দিব্যি উপুড় হয়ে, খুকীর ছোট-ছোট, রাঙা-রাঙা হাত পা নিয়ে তাতে চুমা দিয়ে, পেটে কাতুকুতু দিয়ে হাসিয়ে, ভয় দেখিয়ে কাঁদিয়ে, তাকে কোলে নিয়ে, এমন ক'রে খেলা জু'ড়ে দিত যে, রূপসীও অবাক হ'য়ে যেত!—ছেলেটা যেন কি! এত ভালবাস্‌তেও পারে!

ধনঞ্জয়ের সংসার দিনে দিনে যেন ভ'রে উঠ্‌ছিল। রূপসীর তাড়া খেয়ে

সে ছোট ভাই দু'টির বিয়ের জোগাড়ও আরম্ভ ক'রেছিল, মনের মত মেয়েও জুটে ছিল দু'টি। সামনের অগ্রাণে বিয়ে হবে, এমন কথাও হয়ে ছিল, এমন সময় এই বিপত্তি! এক সঙ্গে তিন জনে তাকে ছেড়ে চলে গেল! আবার নতুন ক'রে সংসার পাতা! সে কি এই ভাঙা হাড়ে সইবে?—আজ যদি গৌরটাও থাকৃত . . .

. ক্ষ্যান্ত এসে বল্‌ল—ওরে ধনা, তুই ত কোন দিকেই চোক দিস্‌ নি কোন দিন; সুর এখন ডাগরটি হয়েচে, বে' না দিলে আর ভাল দেকায় না, নোকে পাঁচ-কতা কইবে। এবার সুরর বে' দে', মেয়ে-জামাই নিজের কাচে রাক্।

সুরভির যে বিয়ে দিতে হবে, ধনঞ্জয় তা জান্‌ত, কিন্তু জামাইকে নিজের কাছে রাখার কথা তার ভাল লাগ্‌ল না, বল্‌ল—সুরকে এই শ্মশানে ঘর বাঁধ্‌তে দিই কি ক'রে পিসি? এ ভিটে আমার সাথেই শেষ হবে।

অনেক খোঁজ ক'রে ধনঞ্জয় কোন্নগরের প্রসন্ন জ'নার ছেলের সঙ্গে সুরভির বিয়ে দিল। ঘর বর দু'ই ভাল, নগদ-পয়সা, জমি-জমা কিছু আছে, মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। ছেলেটি ইলেকট্রিকের কাজ করে, সুরভি সুখেই থাকৃবে।

কিন্তু ভাঙন যখন একবার ধরে, তখন মানুষের শত চেষ্টাতেও কিছু হবার নয়। বাঁধ বাঁধা?—সে ত দৈবোর সঙ্গে লড়াই। বছর না ঘুরতে সুরভি বিধবা হ'ল! ধনঞ্জয় যেন জীবন নিয়ে যমের সঙ্গে দাবা খেল্‌তে বসেছিল, একটির পর একটি ঘুঁটি তার গেছে, আজ সে নিজে কিস্তি-বন্দী!

সেই দিন জীবনে প্রথম ধনঞ্জয় একটা ভাঁটি-খানায় গিয়ে খুব খানিকটা ধেনো মদ খেয়ে, পথের ধারে আবর্জ্জনার ওপর পড়ে সমস্তটা রাত কাটিয়ে দিল। তার পর থেকে এই মদের নেশা তাকে ছাড়্‌তে চাইলেও সে ছাড়্‌ল না। আর কিছুই তার আশা কর্‌বার নেই, কিছু ভাববার নেই,—একটি মাত্র কাজ, মরণের পথ চেয়ে থাকা।

এক দিন ক্ষ্যান্তকে সে বল্‌ল—দেখ্‌ পিসি, সুর যদি আগে মরে, ভগোমানকে হাত জোড় ক'রে পেন্নাম করব। কিন্তুক আমি যদি আগে মরি, ভাব্‌ব, ভগোমান মুদ্দোফরাসেরও বেহদ্দো—

কিন্তু এবার তাদের অপেক্ষাটা যেন একটু বেশীই কর্‌তে হ'ল। সুরভি এগারো থেকে ষোলয় পা দিয়েছে। সে আর-এক ভাবনা। দিন-কাল যে মোটেই ভাল নয়!

৩

ধনঞ্জয়ের শরীর ক'দিন ভাল ছিল না, কাজেরও কামাই যাচ্ছিল। সেদিন সকালে ঘরের দাওয়ায় রোদে বসে, রূপসীর হাতে-লাগান ফলভরা একটা ডালিম গাছের দিকে সে তাকিয়ে ছিল, এমন সময় ভুবন মণ্ডল, একটি জীর্ণ-শীর্ণ লোককে নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—একে চিন্‌তে পারিস্ মিস্তিরি?—

ধনঞ্জয়ের বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌ল—গৌর! কিন্তু ওকি চেহারা তার!

গৌর মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। ধনঞ্জয় ছুটে তার কাছে এসে তার মুখখানা তুলে ধ'রে কি বল্‌তে চেষ্টা করল, পার্‌ল না।

ভুবন বল্‌ল—কলকেতায় সওদা কোত্তে গেছ্‌নু কাল, শ্যামবাজারের মোড়ে একটা ফুটপাতের ওপর ও বসে ভিক্কে কর্‌ছেল। ওর কাচে গে' একটা পয়সা দিতে যেয়ে মুকখানা কেমন চেনা-চেনা নাগ্‌ল! নাম জিগ্‌গেস কোত্তে বল্‌লে, গৌর। বাড়ী কোতায় জিগ্‌গেস কোত্তে চুপ ক'রে রইল।—চেহারা হয়েচে দেক্ না, যেন বের্‌লো কাট! কলকেতার শহরে ভিকিরীর ভিড় কি না বাড়ালেই নয়? তোর ঘরের ভাত রইল পড়ে, তুই গেলি ভিক্কে কোত্তে! তাও কি পেলি দু' মুটো? সে হ'ল বড় নোকের জায়গা, গরীব দুঃখী সেখেনে কি বাঁচে? পথের ধারে পড়ে থাক্‌লেও কেউ ফিরে তাকায় না।

ধনঞ্জয়ের পায়ের কাছে বসে গৌর কেঁদে ফেল্‌ল। ধনঞ্জয় রাগের সুরে বল্‌ল—চ' হতোভাগা, তোকে চালের বাতায় টাঙিয়ে আচ্ছা ক'রে জল-বিচুটি দি, নৈলে তোর চৈতন্ন হবে না—

কিন্তু কার্য্যত দেখা গেল, সে তাকে এক রকম বুকে করেই দাওয়ায় এনে বসাল, তার পর সুরভিকে ডেকে বল্‌ল—সুর, যা ত মা চট ক'রে এক সরা মুড়ি আর গোটা কতক নারকোল নাড়ু নে' আয় ত—

সুরভি খাবার এনে গৌরের সাম্‌নে ধ'রে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কি ব্যাকুলভাবে জ্ঞানহীনের মত সে খেয়ে চলেছে! এমন ক'রে মুখে গ্রাস তুল্‌তে সে কা'কেও দেখে নি। চিবোবার দেরী যেন তার সইছিল না!—এই কি সেই গৌর?—

গৌর ফিরেছে, এ-কথা পাড়ায় রাষ্ট্র হয়ে গেল। দলে-দলে সবাই তাকে দেখে গেল। সেই সঙ্গে ক্ষ্যান্ত-পিসি তার স্বাভাবিক বকুনির আড়াল দিয়ে যে কথা ব'লে গেল, তাতে গৌরের মনে চিরস্থায়ী গভীর একটা শ্রদ্ধা জমা হ'য়ে উঠ্‌ল।

পিসি বল্‌ল—চোকের মাতা খেয়েচিস্ উন্‌পাঁজুরে! দেক্ না এসে তোর মা'র ঘরটা একবার; ধনা ত ওটাকে যেন ঠাকুর-ঘর ক'রে তুলেচে। ও নিজে ত এই বাইরে পড়েই রাত কাটায়।—আমরা বলি, হাঁরে ধনা, এত ক'রে ও-ঘরটা সাজাচ্চিস্ কা'র তরে? ও বলে, আমার গৌর এসে থাক্‌বে! ও আমার পোড়াকপাল! গৌর আস্‌বে! নেমোখারাম কি চোকে দেক্‌তে পায় যে, ধনার কলজেটা ছিঁড়ে যাচ্চে তার ত'রে।—আমরা যেন তোর কেউ নই, সাত-পাড়ার ক্ষ্যান্তি-পিসি, কিন্তুক এটা ত তোর মা'র ঘর—কি ছুঃখুটাই দিলি পিচেশ! নিজেও একেবারে যমের দোরে যেয়ে দাঁড়িয়েচিস্। ম'রে থাক্‌তিস্ রাস্তায় পড়ে, আমরা জান্‌তুমও না—'

ধনঞ্জয় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

*　　*　　*　　*

নিয়মিত আহার এবং যত্ন পেয়ে অল্প দিনের মধ্যেই গৌর সুস্থ হয়ে উঠ্‌ল। বাড়ী ছেড়ে শব্দময় জনাকীর্ণ অপরিচিত শহরে এসে যেমন দিশাহারার মত পথের ধারে সে প্রথম দিন ব'সে ছিল, শেষ-দিনও ঠিক তেমনি অসহায় ভীত-চাহনি তার চোখে ছিল। শহরের সঙ্গে এতগুলি বৎসরের পরিচয় যেন তার পক্ষে একান্ত বেদনার। সেই পুরাতন দিনগুলির স্মৃতি তার মনে জেগে উঠে মাঝে মাঝে গভীর দুঃখে তার বুক ভরিয়ে তুল্‌ত। সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে ব্যাকুল ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে তার মাকে খুঁজ্‌তে চেষ্টা করেছে,—কিন্তু কোথায় মা? একটি মানুষের চোখে সে স্নেহ-করুণার ছায়া সে দেখ্‌তে পায় নি!—মাকে না দেখে সে বাঁচে কি ক'রে? মা কি একটিমাত্রই থাকে এ পৃথিবীতে?

সে দোকানে কাজ নিল, অফিসের বেয়ারা হ'ল, দিন-মজুরী কর্‌ল, কিন্তু এখানে কেবলই পুরুষ, নির্ম্মম, কঠিন, পাষাণ, লোভী, সহানুভূতিশূন্য। বেশী দিন কোথাও থাক্‌তে পারে না। কিছুদিন কাজ করে, আবার ছেড়ে দেয়। শেষে কি মনে ক'রে গৃহস্থের সংসারে কাজ নিল—নারীর দেখা পেল। ব্যাকুল ভাবে সে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, প্রত্যেককে নীরবে চোখের চাওয়ায় প্রশ্ন করে—তুমি আমার মা?—

কিন্তু এ প্রশ্ন, এ চাহনি অন্য ভাবে নারী দেখে। কেউ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, কেউ এমনভাবে তার দিকে এগিয়ে আসে যে, ঘৃনায় সে নিজে মুখ ফিরিয়ে দূরে স'রে গিয়ে দাঁড়ায়।

সংসারের কাজ ছেড়ে সে হ'ল দেব-মন্দিরের দ্বারের ভিখারী।— 'মাগো, গরীবকে কিছু খেতে দাও মা' বলে নারীর মুখের দিকে তাকায়, নারীর মনে করুণা জাগে, কেউ এক মুঠো চাল কেউ একটি পয়সা দেয়, কিন্তু ওতে কি তার ক্ষুধা মিটবে ? সে অভুক্তই রইল। শেষে একদিন তার মনে হ'ল, মা নেই। সে সব ছেড়ে-ছুড়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। তারপর ভুবনের সঙ্গে তার দেখা। আজ দেখে মা তার ঘরে, মা তার সবার মধ্যে !

গভীর আনন্দে তার বুক ভ'রে উঠ্‌ল। সে ধনঞ্জয়কে বল্‌ল— আমি তোর সাথে কাজে বেরুব বাবা, আমি ত এখন বড় হইচি।—

ধনঞ্জয় তার বুকের বেদনা অনেকখানি যেন কম অনুভব কর্‌ল।

গৌর কাজে লেগে গেল।

ধনঞ্জয় গৌরকে দেখে আর ভাবে—গৌর আমার ঠিক তেম্‌নিটি আচে,— রূপসীর খাম-খেয়ালী পাগ্‌লা ছেলেটা ! কিন্তু সুরভি ভাবে অন্য কথা। তার মনে হয়, এ সে-গৌর নয় ; এ কোন নতুন মানুষ ! সময় সময় তার কথা হাব-ভাব্ চাল-চলন সমস্তই তার অপরিচিত মনে হয়—কেমন যেন লজ্জা করে ! ভাল লাগে, বড় আপনার মনে হয়, কিন্তু ভাই মনে হয় না। কিছুতেই ও-কথা সে ভাব্‌তে পারে না।

আর ঠিক এই কথাগুলিই গৌর অবাক হয়ে ভাবে। দশ বছর যে সুরভিকে নিয়ে কোলে পিঠে ক'রে খেলা ক'রে এসেছে, এ সে-সুরভি নয় ! মাঝের এই ছটা বছরের মধ্যে এমন ক'রে সে বদ্‌লে গেছে যে, তাকে সুরভি না ভেবে অন্য যে-কেউ ভাব্‌তে তার আশ্চর্য্য লাগে না।

একদিন পুকুর-ঘাট থেকে স্নান ক'রে এসে উঠানে দাঁড়িয়ে মাথার ভিজে চুল গামছায় জড়িয়ে নিংড়ে ফেল্‌তে-ফেল্‌তে হঠাৎ সুরভির চোখ পড়্‌ল গৌরের ওপর। বিস্ময়ে মুগ্ধ দুটি চোখের দৃষ্টি তার সর্ব্বশরীরে গৌর বুলিয়ে নিচ্ছে ! সুরভির সমস্ত শরীর যেন জ্বর-তপ্ত হয়ে উঠ্‌ল ! তাড়াতাড়ি বসন সম্বৃত ক'রে নিয়ে সে ঘরের দিকে চ'লে গেল। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে তার পা যেন বেধে যাচ্ছিল।

এর পর থেকে সুরভি বিশেষ সাবধানে গৌরের সঙ্গে ব্যবহার কর্‌ত। কখন আবার সমস্ত সাবধানতার বাঁধ ভেঙ্গে ছোটবেলাকার সুরভির মত সে গৌরকে নিয়ে সহস্র প্রকারে তাকে বিরক্ত ক'রে অভিমান ক'রে ঝগড়া ক'রে ব্যাপারটাকে সহজ ক'রে 'কিছু নয়' প্রতিপন্ন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ত। কিন্তু

গৌরের দৃষ্টি বলে দিত—ঠিক তার বিপরীত কথা। সুরভির বুকের কাঁপন বেড়ে চল্‌ল।

এই চিন্তার অভূতপূর্ব্ব বেদনা এবং আনন্দের মধ্যে ডুবে সে সময় সময় সব যেন ভুলে যেত। তার সুপ্ত-নারীত্ব আকুল তৃষ্ণা বুকে নিয়ে যেন জেগে উঠেছে!

কয়েক মাস এই চোখের চাহনি এবং মুখের হাসির অর্থ অনুসন্ধান ক'রে সুরভির কাট্‌ল। গৌরের প্রতিটি কথা এবং কাজ, চোর বা অপরাধীর মত সে লুকিয়ে আপনার মনে তন্ন-তন্ন ক'রে আলোচনা ক'রে দেখ্‌ত। হাস্‌ত, কাঁদ্‌ত, অভিমান কর্‌ত ঐ চিন্তাদের সঙ্গেই, লোক-চক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু গৌরের দৃষ্টি, সময় সময় এই নির্জ্জন গভীর, গুপ্ত স্থানে এসে প'ড়ে তাকে জানিয়ে দিত—আমিও জান্‌তে পেরেচি সুরভি তোর মনের কতা—

একদিন গৌর হঠাৎ সুরভিকে এসে বল্‌ল—সুর, আমার কতগুলো টেকা তোর কাচ্‌কে জমেচে বল্‌তে পারিস্‌?

সুরভি হিসাব ক'রে বল্‌ল—পেরায় আট-ন'কুড়ি হবে।

গৌর বল্‌ল—ও-থেকে পাঁচকুড়ি এখন দে।

কি কর্‌বি অত টেকা নে'?

এক ছড়া কোড়ি-হার গড়াতে দি'চি' কেষ্ট স্যাক্‌রার কাচ্‌কে।—তা পাঁচকুড়ি না দিস্‌ তিনকুড়ি এখন দে; ওর কাচ্‌কে ত আমার আরো অনেক কাজ হবে, একটু-একটু ক'রে শোদ্‌ দিলেও চল্‌বে।

সুরভি চকিতভাবে একবার গৌরের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝে নিতে চেষ্টা কর্‌ল, তার পর বল্‌ল—এত গয়না গড়াচ্চিস্‌ কা'র তরে?

পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটিতে দাগ কাট্‌তে কাট্‌তে গৌর বল্‌ল—বে' কর্‌ব। এক জোড়া অনন্ত আর চুড়ি গড়াতেও দি'চি'—তোর হাতের মাপ্‌টা দে ত সুর, তোর মতই তার বাড়ন্ত গড়ন, তোর হাতের মাপ তার ঠিক হবে।

এ-রহস্যের সন্ধান সুরভির কানে কানে তার মন ব'লে দিল। তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। সমস্ত রক্ত যেন তার মুখে এসে জমা হল। তবু আপনাকে সংযত ক'রে নিয়ে সহজ পরিহাসের সুরে তাকে বল্‌তে হ'ল—কার মেয়ে রে গৌর? তাদের ঘর কোতায়? আমার বল্‌ তাকে একবার দেকে আসি—

গৌর হেসে বল্‌ল—হেঁ, তোকে বলি, আর তুই সব্বাইকে ব'লে বেড়া, তা আর নয়? তোর অত মাতা-ব্যথায় কাজ কি বাপু, তুই টেকাটা দে' দে না; ফুরিয়ে যায় ন্যাটা।

সুরভি এবার পরিপূর্ণভাবে চোখ তুলে গৌরের মুখের দিকে তাকাল কিন্তু গৌর মাথা নামিয়ে নিয়ে সেখান থেকে সরে গেল, যেন সে ভয়ানক এক অপরাধ করেছে।

সুরভির চোখ দিয়ে জল ঝরছিল। গৌরকে বল্‌ল,—টেকাটা নে'যা'—

গৌর বাইরে যেতে যেতে বল্‌ল—থাক্ আজ আর ও-দিকে যাব না; কাল দিস্।

৪

সে-দিন দুপুর বেলা ঘরের কাজ সেরে কয়েকটি পিতল এবং কাঁসার বাসন নিয়ে সুরভি চৌধুরীদের পুকুর-ঘাটের পৈঁটায় বসে ছাই দিয়ে সে-গুলি পরিষ্কার ক'রে মেজে ঘসে ধুয়ে একধারে সাজিয়ে রাখ্‌ছিল। মনে তার ভাবনার মেঘ যেন ভ'রে উঠেছে! কত রকমের ছবি তার চোখে ফুটে ওঠে, কত সুখ-স্বপ্নে মন ভেসে যায় কিন্তু কি জানি কেন গভীর নিরাশা তাকে যেন বারে-বারে শুষ্ক তৃষিত ক'রে তোলে!

কাজ সারা হ'লে নিজের শরীরের ওপর তার চোখ পড়্‌ল। হাতের ওপর হাত রেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে—নিটোল, রক্তাভ, শীতল। হাত দু'টি উত্তপ্ত গালে ছোঁয়াল। পা দু'টি জলে নামিয়ে দিয়ে তার পরিপুষ্ট গড়ন দেখে অবাক হ'য়ে নিজেই তাকিয়ে রইল। সাড়ীর আবরণে ঢাকা শরীরের মধ্যে কাণায়-কাণায় পূর্ণ যৌবনকে সে যেন দেখ্‌তে পে'ল! সুখের শিহরণ তার সর্ব্ব শরীরের ওপর দিয়ে ব'য়ে গেল! আজ তৃষ্ণা যেন সর্ব্ব শরীরে তার বাসা বেঁধেছে! তার শরীর যেন বারে-বারে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ছে—আমি অভুক্ত, আমি তৃষিত . . . এমন সময় বসন্ত-দূত তার কানে কানে বলে গেল—সুরভি, তোমার বয়স সতেরো . . .

কিন্তু সে-কথা শেষ না হতেই, মানুষের শাস্ত্র শুষ্ক কণ্ঠে তার আরএক কানে গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল—সুরভি, তুমি বিধবা . . .

ঠিক এই সময় পুকুরের দক্ষিণ দিকে বোসেদের প্রাচীর-ঘেরা বাগান থেকে গানের শব্দ ভেসে তার কানে এল—

গাগরী ভাসায়ে জলে,
কাঁচলি খসায়ে ছলে,
কুতূহলে পড়ে ঢ'লে রাই!
হায় গো, পড়ে ঢলে বিনোদিনী রাই॥

সুরভি চম্‌কে উঠ্‌ল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে, একটা বাতাবী-নেবুর গাছে চ'ড়ে একটা লোক বিশেষ মনযোগের সঙ্গে ফলগুলি দেখ্‌ছে। তবু বিরক্তিতে তার মন ভ'রে উঠ্‌ল।—আমি যেখুনি ঘাট্‌কে এস্‌ব, মুক্‌পোড়া হয় নেবু গাচ, নয় প্যেয়রা গাচ, নয় জাম গাচে থাক্‌বেই!

পাকা ফল পেড়ে সাবধানে মাটিতে ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে লোকটি গাইছে—

হেথা, কেলি-কদম্ব মূলে
কি জানি কি গুণে ভুলে
আপনা পাসরে শ্যামরায়!
হায় গো, গোপীবল্লভ শ্যাম রায়॥

সুরভি সঙ্গীতকারীর উদ্দেশে মনে মনে গালি বর্ষণ করল, কিন্তু গান থাম্‌ল না—

রাধা-তনু মধু-ভরা
যেন জনাই-এরই মনোহরা!
আহা, জগতে তুলনা দিতে নাই!
হায় গো, ঢ'লে পড়ে বিনোদিনী রাই॥

কিন্তু এবারকার গানের কথা শুনে রাগের মধ্যেও সুরভি হেসে ফেল্‌ল। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে, বাসনগুলি হাতে নিয়ে উঠ্‌তে যাবে এমন সময় চৌধুরীদের নতুন-বৌ হাসি-মুখে পান চিবোতে-চিবোতে ঘাটের দরজা দিয়ে কয়েক ধাপ্‌ সিঁড়ির নীচে নেমে এসে, সুরভিকে বল্‌ল—কি লো সুরি!—আজ যে এত বেলা?—

সুরভি বল্‌ল—আর দিদি, রেঁধে বেড়ে, ঘর-সংসারের কাজ সেরে এই বাসন ক'খানা ধুতে এইছিনু তোমাদের ঘাট্‌কে।

তা আজ কি রাঁধ্‌লি?

কি আর রাঁদ্‌ব দিদি, গরীব মানুষ, বেশী কিচু ক'ত্তে পারি নি—এই তোমার গে ভেঁট্‌কি মাচের কাঁটা আর পেঁজ্‌কালি দে' বেশ ঝাল্‌ খর-খর একটা চচ্চড়ি ক'রে ছিলুম; আর ঘুসো-চিংড়ির টক্‌।—খেতে ত আমরা তিনটি প্রাণী।

নির্‌মিষ্যি কিছু করিস্‌ নি? তুই খেলি কি দিয়ে?

নির্‌মিষ্যি আর কোতায় পাব দিদি? আমিও ঐ খেলুম।

ওমা! তুই না বিধবা?—তুই সব খাস্‌?—মাংস?—

না খেলে বাবা যে দুঃখু করে দিদিমণি।

মরণ আর কি! বাপের দুঃখুর জন্যে পরকাল দিবি?—

তা বাবাই ত আমার ইহকাল পরকাল সব--

তবে বল্ না কেন ও-সব ভালবাসিস্।—একাদশীর দিনও খাস্?

সুরভি স্বীকার কর্‌ল, সে এ-অপরাধও করে।

নতুন-বৌ বল্‌ল—তবে ফের্ বে' কর্ না কেন?

কথাটা সুরভির ভাল লাগ্‌ল না। বল্‌ল—বে' কি আর দু'বার হয় দিদিমণি? —তবে বেঁচে থাকতে ত হবে, তাই খাই।

কথা ঘুরিয়ে নিয়ে নতুন-বৌ বল্‌ল—তোকে কে গান শোনাচ্ছিল রে সুরি?—

সুরভি বল্‌ল্—আমাকে শোনাতে যাবে কেন? ঐ বোসেদের ছোটবাবু গাইছেল।

জিভ দিয়ে ঠোঁট দু'টি রঙিয়ে নিয়ে নতুন-বৌ বল্‌ল—রবিবাবুর একটা কবিতায় প'ড়েছিলুম—রতি যখন নাইতে নেমেছে, মদন তাকে দেখ্‌ছিল।—তা বেশ কবিত্ব কর্‌ছিলি ত তোরা দু'জনে?

কে রবিবাবু, কে মদন, কে রতি, সুরভি তা যে ঠিক বুঝ্‌ল তা মনে হ'ল না কিন্তু সে হঠাৎ বেজায় চ'টে উঠে বল্‌ল—হেঁ, ও-সব ধম্ম কতা ও-মুকপোড়া জানে কি না? ও পাঁচালী গাইছেল। বাঁশবুকো খালি মেয়েমানুষের পেচোন্-পেচোন্ ঘুত্তে জানে। বাগ্দী আর ডোম-পাড়ায় আনা-গোনা। সে-দিন কি মারটাই না খেলে গণ্‌শা ধোপার হাতে! আবার বলে ভদ্দোর নোক!—নজ্জা কি আচে?—

নতুন-বৌ শহরের মেয়ে, সে কথা বল্‌তে জানে। বল্‌ল—ছোটবাবুর ওপর খুব চটেছিস্ ত? কিছু পাস্ নি বুঝি?

অবাক হ'য়ে সুরভি বল্‌ল—কি পাব?

নতুন-বৌ হেসে বল্‌ল—এই গৌরের কাছ থেকে যা পাস্।—কেষ্ট স্যাকরা বল্‌ছিল সে-দিন মা'র কাছে, গৌর তোকে অনেক গয়না গড়িয়ে দিয়েছে।

এবার সুরভি হেসে ফেল্‌ল। বল্‌ল—আমার পোড়া কপাল! আমাকে দেবে কেন? ও ওর বো'র জন্মে গড়িয়ে রাকচে।

নতুন-বৌ বল্‌ল—তার মানেই তাই। আর ঢাক্-ঢাক্ গুড়্-গুড়্ কত কর্‌বি? তুই বাপের বেশ রোজগারী মেয়ে তা সবাই জানে—'

এক নিমেষে সুরভির মুখ রক্তশূন্য হ'য়ে গেল। নতুন-বৌ-এর দিকে তাকিয়ে সে বল্‌ল—আমাদের ঘরে ঢাক্-ঢাক্ গুড়্-গুড়্ থাকবে কেন দিদি, সে আচে তোমাদের ঘরে, যত ভদ্দোর নোকের ঘরে। এই ত ঘোষাল-দিদি, কত

ধর্ম্মিষ্টি, পিট্-পিটে ; ছোটনোকের ছাওয়া মাড়ায় না। এদিকে একাদশীর দিন একগলা গঙ্গায় দাঁড়িয়ে সুয্যি-পেন্নাম কর্‌বার সময় সন্দেশ মুকে পুরে দেয়। ডুব দে' জল খায়—আমরা ছোটনোক খাই ত খাই। সে সব্বাই জানে। বে' যদি কর্‌ব মন করি ত কর্‌ব। তা ব'লে চাটুয্যে-বো'র মত ভাসুরের সাথে বচোর বচোর কাশীতে তিথ্যি ক'ত্তে যাবো না।

নতুন-বৌ কোন উত্তর দেবার পূর্ব্বেই সে তর্-তর্ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে বাগানের ভিতর দিয়ে পথে নেমে সোজা ঘরের দিকে চ'লে গেল।

বাতাবী-নেবুর গাছ থেকে, পাঁচীলের ধারের পেয়ারা গাছে এসে বোসেদের ছোটবাবু নতুন-বৌ-এর দিকে তাকিয়ে তখন গাইছে—

কিবা ঢল-ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি
অবনী বহিয়া যায়!

কিন্তু আর কোন কথা শোন্‌বার পূর্ব্বে নতুন-বৌ তাড়াতাড়ি জিভ কেটে, একগলা ঘোম্‌টা টেনে বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

৫

সন্ধ্যাবেলা সুরভি একলাটি চুপ্ ক'রে বসে ছিল। কিছু দিন থেকে আপনাকে নিয়ে চিন্তার তার যেন আর শেষ ছিল না। একটানা ভাবে সে ভাব্‌ত। কিন্তু সেই ভাবনাটা ঠিক একটা বিষয় নিয়েই নয়; প্রত্যেকটির রূপও ছিল বিভিন্ন। কোনটা রঙিন, কোনটা নেশায় ভর্‌পুর, কোনটা মর্ম্মদাহকারী এবং প্রত্যেকটি চিন্তা অতৃপ্তি দিয়ে ভরা! সে শান্তি পেত না কা'রো মধ্যে।

এই অন্ধকারের মধ্যে মানুষের চোখের দৃষ্টি সে যেন সমস্ত শরীরে অনুভব কর্‌ছিল। সবাই তাকে অমন ক'রে দেখে কেন? তাদের সে-চাহনিতে অমন লোলুপ ভাব থাকে কেন? এবং সব চেয়ে বেশী সে আশ্চর্য্য হ'ত এই কথা মনে ক'রে যে, ও-গুলো তার ভাল লাগে!

তার এই সমস্ত চিন্তার মধ্যে গৌর যে কখন সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে তা সে জান্‌তে পারে নি! সে তাড়াতাড়ি উঠে বল্‌ল—চ' তোকে খেতে দি'।

গৌর বল্‌ল—সে হ'বে'খন। বেহারীর জ্বরটা খুব বেড়েচে। চার পাঁচ রাত ত পিসি তার কাচ্‌কে ছেল, আজ আবার তারও অসুক! পিসি বল্‌লে, আজ রাতটা তুই গে' যদি থাকিস্, পিসি একটু ঘুমিয়ে নেয়। পিসি সেতায়ই থাক্‌বে; আমিও যাব ভাব্‌চি।

ধনঞ্জয় ঘরে এলে তাকে এবং গৌরকে খাইয়ে নিজে খেয়ে ঘর পরিষ্কার ক'রে বাসন মেজে গৌরের সঙ্গে সুরভি যখন বিহারীর ঘরে এল তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা। বিহারী জ্বরের ঘোরে কত কি বক্‌ছে। জাগরণ-শ্রান্ত ক্ষ্যান্ত-পিসি তার মাথার কাছে ব'সে ঘুমে ঢুলে পড়্‌ছে।

ক্ষ্যান্তকে ঘরের একপাশে শুইয়ে সুরভি রোগীর বিছানার পাশে জায়গা নিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই রোগী তার দিকে ফিরে ছেলেমানুষের মত বল্‌ল—একটু বাতাস কর্ না মা, বড্ডো গা জ্বল্‌চে যে—

সুরভি তাকে বাতাস কর্‌তে কর্‌তে মাথার ওপর তার ঠাণ্ডা হাতখানা রাখ্‌ল, রোগী কেমন যেন গভীর তৃপ্তিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে চোখ বন্ধ কর্‌ল।

সুরভির সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। এমন চাউনি তার বাবা ছাড়া তাকে ত আর কেউ দেয় নি! গৌরের দৃষ্টিও অমনি স্নিগ্ধ কিন্তু সেটা যেন প্রাণ-পোড়ানি একটা আবরণে ঢাকা থাকৃত সব সময়। তার বুক কেঁপে উঠ্‌ত। অশান্তি সে-চাহনিতে বাড়্‌ত—কম্‌ত না। আজ বিহারী প্রথম তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-সারে সুরভিকে তৃপ্তি দিল।

তিন জন মানুষের প্রাণপাত পরিশ্রমে ও সেবায় বিহারী প্রায় একমাস পরে সুস্থ হয়ে উঠ্‌ল। ক্ষ্যান্ত-পিসিকে বিহারী তার মনের কৃতজ্ঞতা জানাতে গেলে সে বল্‌ল—তোর যা বল্‌বার তা সব সুরকে বল্। ওই ত তোকে বাঁচালে। জ্বরের ঘোরে তুই যে ওকে মা বলিছিলি, তার পর থেকে ওর চোকে কি আর ঘুম ছেল? মায়ের সেবা কল্লে বটে আমার সুর!

বিহারী সুরভিকে কোন কথা বল্‌ল না বটে কিন্তু এমন মানুষ পাড়ায় রইল না, যার কাছে সে সুরভির স্নেহের কথা বল্‌ল না। এর ফল কিন্তু ভাল হ'ল না।

ভুবন মণ্ডলের মেয়ে শশীর সঙ্গে বিহারীর বিয়ের কথা পাকা-পাকি হয়ে ছিল। ভুবনের স্ত্রী গোলাপ, কিছুদিন থেকে সুরভির ওপর হাড়ে চটেছিল। গোলাপের প্রথমে ইচ্ছা ছিল, গৌরের সঙ্গে শশীর বিয়ে দেয়; কিন্তু এই গৌরকে সুরভি 'গিলে খেয়েচে' এবং সুরভির সম্বন্ধে পাড়ার নোকের পাঁচ-কতাও সে বিশ্বাস ক'রে—ঢলানি ছুঁড়ি সুরিইত যত নষ্টের মূল!

গোলাপের কাছে কথায় কথায় সুরভির প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে গিয়ে বিহারী দেখ্‌ল 'ঘেন্নায়' তার মুখে কতকগুলি রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে!

এবং গোলাপ বিশেষভাবে বিহারীকে জানিয়ে দিল, সুরি সর্ব্বনাশী শতেক-খায়ারীর সাথে ভাব রাখ্‌লে এ বাড়ীতে তার বে' করা হবে না।

বিহারী বড় বিপদে পড়্‌ল। শশীকে তার পছন্দ হয়েছিল। তা ছাড়া মণ্ডলের ঘরের জামাই হ'লে তার সব দিক দিয়েই মঙ্গল। কিন্তু সুরভির অপমানও সে সইতে পার্‌ল না। সে-ও বেশ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল—তার পায়ে ধ'রে না 'সাদ্‌লে' শশীকে সে নেবে না।

মণ্ডলের অবস্থা ভাল ছিল; সে অন্যত্র মেয়ের সম্বন্ধ কর্‌তে লাগ্‌ল। বিহারী কেমন মন-মরা হয়ে গেল।

সুরভি সব দেখ্‌ল, শুন্‌ল, কি ভাবল। তার পর একদিন বিহারীকে ডেকে বল্‌ল—তুই বে' যে ভেঙ্গে দিলি?

বিহারী প্রথমটা কিছু মান্‌তে চাইল না, শেষে সুরভির কথার ফেরে ধরা প'ড়ে স্বীকার কর্‌তে বাধ্য হ'ল যে, খ্যামোকা একটা মানুষ তার মা'র নামে দুষবে, ছেলে হ'য়ে এটা কি ক'রে সে সহ্য করে?

সুরভির বুক কাণায় কাণায় ছাপিয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু সে-ভাব চেপে, হেসে বল্‌ল—তুই জেতে কৈবোত্ত বলিস্ নিজেকে কিন্তুক আমার মনে নেয় তুই চাষা ধোপা। নইলে এমন বুদ্ধি!—কে তোর সাত-কুলের মা? রোগ ধ'রে ছেল তাই সেবা করেচি। সবাই ত করেচে।

বিহারী বল্‌ল—সে কতা ত হ'চ্চে না; তুই আমার কে, সে আমি বুজ্‌ব। কিন্তুক ওরা বলে, বোসেদের ছোট কত্তা—

সুরভি বল্‌ল—তার মুকে আগুন।

কথা কয়টি ব'লে সে তার ডান হাতের অনন্তটার দিকে তাকিয়ে মুখটিপে একটু হাস্‌ল। তার পর ইঙ্গিতপূর্ণ চোখ দু'টি বিহারীর মুখের ওপর তুলে বল্‌ল—পেলে তুই ছাড়িস্?—

সুরভির শরীরে কোন অলঙ্কার সে দেখে নি কোন দিন। বিহারীর কেমন যেন সব গোলমাল হ'য়ে গেল। হঠাৎ তার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠে এল। জ্বলন্ত চোখ দু'টি সুরভির মুখের ওপর তুলে বল্‌ল—সুরভি, তুই—

কিন্তু কথা তার শেষ হ'ল না। সুরভির মুখের কদর্য্য সে হাসির ইঙ্গিত সহ্য কর্‌তে না পেরে সে আস্তে আস্তে উঠান থেকে পথে বেরিয়ে গেল।

সুরভি তার অবসন্ন দেহটা টেনে এনে তার মা'র ঘরের মাটিতে লুটিয়ে দিল। সে-দিন্‌কার মত বুকভাঙ্গা কান্না সে জীবনে কোন দিন কাঁদে নি। ভাঙা-ভাঙা

গলায় বল্‌লে—আজ আমার একটা রাজার সম্পত্তির চেয়ে বড় জিনিস গেল মা, তুই তাকে দেকিস্—

*　　*　　*　　*

বিহারী নিজের থেকে সেধে গিয়ে গোলাপের কাছে ক্ষমা চাইল। তার একটা মস্ত ভুল হয়েছিল স্বীকার কর্‌লে। গোলাপের মন প্রফুল্ল হ'ল, এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শশীর সঙ্গে বিহারীর বিয়ে হয়ে গেল।

সুরভি তার মা'র ঘরে এসে সে-দিন সন্ধ্যাবেলা আবার কেঁদে বল্‌লে—মাগো, আমার বুকের রক্ত দে' শশীর পায়ে সদোবার আল্‌তা পরিয়ে দিলুম—ও অক্ষয় হোক।

সুরভির এ কান্না গৌর দেখ্‌ল, তার পর সে হ'য়ে গেল সেই ছোটবেলাকার গৌর! গাম্ভীর্য্য বলে তার মধ্যে আর কিছুই রইল না। সদানন্দ, প্রাণ-খোলা হাসি, সহস্র রকমের ছেলেমানুষি-বায়না। কথায়-কথায় অভিমান, রাগ—সুরি পোড়ারমুখী ম'লে সে বাঁচে।

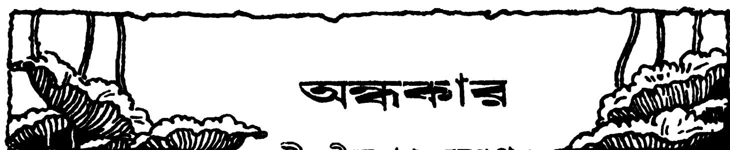
কিন্তু এ-সব যে ফাঁকি তা সুরভি বোঝে, তার মন বেদনায় টন্-টন্ ক'রে ওঠে। চেষ্টা ক'রে গৌরের সুরের নকল ক'রে সে মাঝে মাঝে বলে—বাবা, গৌরের বে' দে, আমি আর পারব না ঘরের কাজ ক'ত্তে।

ধনঞ্জয় মেয়ে দেখ্‌বার চেষ্টা ক'রে।

গৌর বলে—ফের্ যদি আমায় ঘাঁটাবি আমি চলে যাব—

*　　*　　*　　*

দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে আসে। বসন্ত-দূত সুরভির কানে কানে ব'লে গেল—আর একটা বছর কাট্‌ল সুরভি—তোমার বয়স আঠারো—



অন্ধকার

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ।

অন্ধকার ওগো অন্ধকার,
আজি ভাদ্র-অমানিশাযোগে
ক্ষুদ্র ঘরে বন্ধ করি' দ্বার
তোমারে করিব আবাহন—
তোমারে করিব নমস্কার ।

২

অন্ধকার ওগো অন্ধকার !
জ্যোতিরূপ এ-বিশ্বের তুমি সুনিশ্চিত মহাভবিষ্যৎ ।
অজ্ঞাত গহনে তব একদিন সমগ্র জগৎ
ছুটাইয়ে সপ্ত-রশ্মি-রথ,
অন্ধ বৎ
হারাইবে পথ ।
বিচিত্র ভুবনভরা আলোক চিত্র করি একাকার
দিকে দিকে ব্যাপিবে তোমার
সর্ব্ব গ্রাসী স্থির কৃষ্ণ হাসি ;
অন্ধকার ওগো অন্ধকার !

৩

তোমার নিঃশূন্য গর্ভ হ'তে.
রক্তালোক স্রোতে
ভরি' দিয়া ব্যোম,
যে দিন প্রথম

জন্ম মাত্র শিশু-বিশ্ব করিল ক্রন্দন
ওম্ ওম্ ওম্—
তুমি মাতা মূর্চ্ছাগতা,
কে করে সান্ত্বন!—
অদ্যাবধি তাই,
বিশ্ব হায়
কেঁদে কেঁদে ফিরে নিঃসহায়,
কেঁদে ফিরি আমরা সবাই।
সমুখে আলোকে খুঁজে যতটুকু পাই,
পিছনে ছায়ায়
অনন্ত ব্যাপিনী তব ঘুমন্ত মায়ায়
দ্বিগুণ হারাই।
জনমক্ষণের সেই অশান্ত ক্রন্দন
যুগে যুগে জীবে জীবে হ'ল চিরন্তন।
দিশা হারা বিদেশী সবাই
কেহ নাই
ঘুচাইতে ভ্রমণের ভ্রম ;
যত কাঁদি তত জপি আদি আলোকের ক্রন্দনের বীজ
ওম্ ওম্ ওম্!

৪

অন্ধকার ওগো অন্ধকার!
আঁখির এ ক্ষুদ্র তরণীতে যে হয়েছে পার
আলো পারাবার,
শুধু তার কাছে ধরা দে'ছে তব অপরূপ
কালো রূপ।
সে দেখেছে—
আলো-রূপী শিবে করি' শব, চরণে চাপিয়া
কাল-রূপী মহাকালী, নৃত্যপরা নিখিল ব্যাপিয়া।

আঁখি মুদে সে বলেছে কেঁদে
'তিমিরে তিমিরহরা সর্ব্বনাশী তুমি মা আমার !'
ওগো অন্ধকার !
তাহার শ্রবণে,
জীবনের বাদল-পবনে
কেবল পশিছে আসি'
তমঃপুঞ্জ তমালের কুঞ্জ হ'তে
তোমারই সুদূর আহ্বানের বাঁশী।
ঘন ঘোর ভাদরের রাতে
সুরের পশ্চাতে
তোমারি গহনে এসে
পেয়েছে সে
নব-ঘন শ্যাম শ্যামে তার।
অন্ধকার ওগো অন্ধকার !

৫

অন্ধকার ওগো অন্ধকার !
বন্ধ ঘরে মুক্ত করি দ্বার
আজি এ অনিদ্র আঁখি তারা
হেরিছে অগণ্য তারা তোমার মাঝার।
ওরা নাকি নহে ক্ষুদ্র ; সব সুবৃহৎ
তেজে ও বিদ্যুতে ভরা জনে জনে বিশাল জগৎ !
এত শক্তি, এত তেজ, আলো—
না জানি তাহারা,
তোমার সাহারা গা'য়, বিন্দু বিন্দু বারি প্রায়
কোথায় মিলালো ?
শত সূর্য্য নাকি
তব মহারণ্য-পুরে দূরে দূরে হয়েছে জোনাকি !
তাই ভাবি আমি,—
আলোরে করেছে ক্ষুদ্র আলোকের স্বামী ;

তোমা' 'পরে তার
নাই কোন অধিকার !
আঁখি তারা হ'তে
গগন তারার পথে পথে,
চির প্রসারিত নিত্য অনুভূত তব বিরাট বিস্তার।
নিদ্রিতা জননী বক্ষে সুপ্তোত্থিত শিশু
খেলা করে ল'য়ে কণ্ঠহার।
কোন মহাশিশু ক্রীড়া সুখে
তব বুকে
ঘুরাইছে জ্যোতির্মালা বিশ্ব শৃঙ্খলার ?
অন্ধকার মহা অন্ধকার !

৬

অন্ধকার ঘোর অন্ধকার !
অসীম মানসাকাশে মম
জনম জনম,
কোটি কোটি বৃহৎ জ্বালার
জ্বলে যে নক্ষত্ররাজি ক্ষুদ্র হয়ে বিস্মৃতির পার,
তারি 'পরে তব
দাও টানি কৃষ্ণ-যবনিকা,
লভুক নির্ব্বাণ—শেষ রশ্মি-শিখা।
দাও সমাপন-শান্তি, দাও তৃপ্তি মহা-সান্ত্বনার।
শব্দ স্পর্শ রূপ গন্ধহীন
রসে ভরা তোমার পাথারে
হউক বিলীন
সত্ত্বা মোর, মোর অহঙ্কার।
অন্ধকার, চির অন্ধকার !

বাংলা সাহিত্যের কথা

—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সাধারণত কবিতার দুটো ভাগ হ'তে পারে, একটা Lyric আর একটা narrative বা কাব্য। কারণ মানুষের অন্তরের অনুভূতি ও বাইরের ক্রিয়া-কলাপ নিয়েই কবিতা। প্রথমেই যে বাংলার Lyric-কবিতার বিষয়ে এত বল্লাম তার কারণ আমাদের সাহিত্যের এর চেয়ে সুন্দর সৃষ্টি আর কিছু হয় নি এবং ভাবের গভীরতা বা কমনীয়তার দিক দিয়ে বাংলার Lyric-কবিতা জগতের যে-কোন সাহিত্যের সঙ্গে একাসনভুক্ত হ'তে পারে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে কাব্য কখনও প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি। তার মূলে বোধ হয় আমাদের সামাজিক জীবন। কারণ উপযুক্ত ক্ষেত্র ও উপকরণের অভাবে কাব্য এখানে বৃদ্ধি পায় নি। কাব্যের সৃষ্টি হয়,জাতির জীবনের বহু ঐশ্বর্য্যশালী শক্তির উৎস থেকে তার দ্বন্দ্ব ও আকাঙ্খার নিয়ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। বাঙালীর জীবনে এই অমর-কাহিনী রচনা করবার ক্ষেত্র ছিল না। তাই আমাদের ভাষায় যখনি কোন কাব্য রচনা করা হয়েছে, তার মূল বিষয় নেওয়া হয়েছিল অপর কোন সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে। তাই বাংলা ভাষার দুটি প্রধান কাব্যই সংস্কৃত মহাকাব্য, রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ। বাংলা ভাষায় রামায়ণের রচয়িতা কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাসের সমসাময়িক ছিলেন। Lyric ও কাব্য এক সময়েই সৃষ্ট হয়।

আমরা জানি কি আব-হাওয়ার মধ্যে আমাদের সাহিত্যে কাব্যের সৃষ্টি হয়েছিল। রামায়ণ অনূদিত হয়েছিল, পাঠান রাজাদের ইচ্ছায় ও অনুগ্রহে। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মপ্রচারে মুসলমান রাজাদেরই সাহায্য ও অনুগ্রহ সংশ্লিষ্ট। মুসলমান বিজয়ের প্রাক্কালেই বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছিল। রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র ও মহাভারতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণুর অবতার বলে পরিগণিত। ইউরোপে সাধারণ ভাষায় বাইবেলের অনুবাদের মত

রামায়ণ ও ম [illegible] জাতির ধর্ম্মজীবনে বিশেষ সাহায্য করেছিল

এ কথা ঠিকই যে, ভারতবর্ষের সাহিত্যে রামায়ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ romance এবং মহাভারত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্য। কিন্তু বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হওয়ার ফলে মূলকাব্যের সৌন্দর্য্য ও ভাবের মহিমা বহুপরিমাণে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তার কারণ রামায়ণের রচয়িতা কৃত্তিবাস কিংবা মহাভারত রচয়িতা কাশীদাস কেউই কোন বীরযুগে জন্মগ্রহণ করেন নি, তাই মূলকাব্যের মধ্যে অতীত বীরযুগের যে ঐশ্বর্য্য ও তেজ ছিল, বাংলাভাষায় তা ফুটে ওঠে নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বাঙালী কবিদ্বয়ের হাতে মূলকাব্যের নায়কগণ তাঁদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এমন ভাবে অনেক সময় হারিয়ে ফেলেছেন যে, তাঁদের চেনা কষ্টসাধ্য হয়। করুণভাবপ্রধান দিকটাই অন্য সব রসকে ছাপিয়ে উঠেছে। প্রমাণস্বরূপ কৃত্তিবাসের রামায়ণ থেকে একটা ঘটনা নেওয়া যেতে পারে।

কৃত্তিবাসে আছে, লঙ্কার সমর-অবসানে রাবণ রণ-ক্ষেত্রে রোদন করছেন। অত্যাচার ও হিংসার মূর্ত্ত বিগ্রহ লঙ্কাধিরাজ রাবণকেও কৃত্তিবাস শেষে একজন পুরো বৈষ্ণব ক'রে দিয়েছেন। সাহিত্যের দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে এই দুই কাব্যের তত বেশী সার্থকতা ছিল না কিন্তু লোকশিক্ষার হিসাবে এই দুই কাব্য অতুলনীয় সাহায্য করেছিল। সাহিত্যহিসাবে আর যাই ত্রুটি থাক্ না কেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই দুখানি কাব্য আমাদের সাহিত্যে দুখানি সবচেয়ে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান্ বই। কাব্যদুটির কথাবস্তু এত চমৎকার যে, যে কোন অনুবাদে তার বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। আমাদের সাহিত্যে আমাদের মাটী থেকেও কতকগুলি কাব্য জন্মগ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক সংগ্রাম থেকেই সমস্ত জাতীয় কাব্যের সৃষ্টি। আমাদের সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। প্রচলিত লৌকিক কাহিনী নিয়ে এই সব কাব্যের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্মানুমোদিত ভগবানের ত্রিমূর্ত্তি ও লৌকিক দেবদেবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপার নিয়ে এই সমস্ত কাব্যের উৎপত্তি।

এই সমস্ত কাহিনীর দুটা প্রধান ভাগ আছে—একটি চণ্ডীর পূজা আর একটি মনসা পূজা। চণ্ডী ও মনসা কালক্রমে অজ্ঞাতসারে হিন্দুর সর্ব্বদেবতা-মণ্ডলীর মধ্যে অন্তর্গত হয়ে গিয়েছিলেন। এই সমস্ত কাহিনীর মূল বিষয় হচ্ছে, যে কোন লোক কোন বিশিষ্ট দেবদেবীকে না মানার দরুণ তাঁর কোপ দৃষ্টিতে পড়েছিল ; তার ফলে, সেই লোকটিকে অশেষ রকম দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল।

যারা এই দেবদেবীদের কোপদৃষ্টিতে পড়্‌ত তারা সাধারণত হয় কোন রাজকুমার নয় কোন সওদাগর। তারা এই সব লৌকিক দেবদেবীদের মান্‌ত না। তাদের ধর্ম্ম আরও গভীর ছিল। তারা শৈব ছিল এবং তারা তাদের ধর্ম্মের প্রতি একনিষ্ঠ থাকার দরুণ অশেষ রকম দুঃখ দৈন্য সগৌরবে সহ্য কর্‌ত। এই সমস্ত গল্পের মধ্যে যদিও গ্রাক্‌ ট্রাজেডীর সমস্ত উপকরণ দেখ্‌তে পাওয়া যায় তবুও বাংলার কবিদের হাতে এই সমস্ত বিষয় নিতান্ত একঘেয়ে ও নীরস বর্ণনামাত্র হয়ে উঠে ছিল। এই সমস্ত গল্পের সৃষ্টি হয়ে ছিল সাহিত্য-সৃজনের দিক দিয়ে নয়; লোকের মনে এই সমস্ত দেবদেবীর অলৌকিক ক্ষমতা ও তার নির্ম্মম প্রয়োগের কথা বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্যে এই সব কাব্যের সৃষ্টি হয়। স্বভাবতই সেই জন্য এই সব কাব্য সাহিত্য-সৃষ্টির সহায়তা কর্‌তে পারে নি।

এই সমস্ত কাব্য বাংলার লোকসাহিত্যের অন্তর্গত এবং এদের বিশেষত্ব এই যে, এর কোথাও কোন কষ্ট কল্পনা নেই। যাহাই হ'ক আমাদের কাছে এই সমস্ত কাব্যের একটা বিশিষ্ট প্রয়োজনের দিক আছে। বাংলার অতীত যুগের জীবনের ও অন্তরের কথা এই সমস্ত কাব্যে নিখুঁতভাবে আঁকা আছে। এমন খোলাখুলি ও সঠিকভাবে এই সমস্ত গ্রাম্য কবিগণ তাঁদের সমসাময়িক জীবনের কথা গেয়ে গেছেন যা সকলের প্রিয় না হয়ে যায় না। এবং এই সমস্ত গল্পের মাঝে মাঝে একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্যে এমন সরস গোপন রসিকতা ও শ্লেষের স্পর্শ আছে যা কখনও অশ্লীলতা বা নোংরামির পরিচয় দেয় নি। এটা আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই জন্যে যে, ইংরাজ-বিজয়ের পূর্ব্বে আমাদের সাহিত্যে এড়িয়ে যাওয়া বা গোপন করাকে সাহিত্যিক শক্তির পরিচয় বলে ধরা হত না। এই সমস্ত সহজ সুন্দর সুখভরা গ্রাম্য জীবনের ছবি দেখে আমরা আজ দীর্ঘশ্বাস ফেলি। এবং কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, আমাদের মধ্যে যিনি একটু বেশী কল্পনা-প্রবণ তিনি এই সমস্ত ছবি থেকে আপনার কল্পনার সাহায্যে মনে মনে এক অপূর্ব্ব পার্থিব স্বর্গের সৃষ্টি করেন। তাই আজ রাজনৈতিক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে রব উঠেছে—গ্রামে ফিরে চল। মন স্বভাবতই চায়, আধুনিক যুগের এই ঝঞ্ঝা-দাপট থেকে অন্য কোথাও কোন চিরশান্ত নিরালা নীড়ের আশ্রয় নেয়। কিন্তু আমার মনে হয় আজ আমরা ফির্‌তে পারি না—সমাজের দিক দিয়েও নয়—মনের দিক দিয়েও নয়। আর আমাদের মত অল্প বয়সের জাতির কি এরি মধ্যে পেন্‌সন্‌ নেওয়া চলে? আমাদের অতীত জীবনের একটা বিষয় আমরা যেন না

ভুলি যে আমাদের, পূর্ব্বপুরুষেরা সমুদ্র-বাহী ছিলেন। এই কথা বারে বারে আমাদের কাব্যে পাই।

ধর্ম্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার দরুণ আমাদের সাহিত্য ধর্ম্মভাবাপন্ন ও সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এর একটা মস্ত বড় ব্যতিক্রম আছে—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর। দোষেগুণে অপূর্ব্ব ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সর্ব্বপ্রথমে আমাদের সাহিত্যে রক্তমাংসের সৃষ্টি করল। বিদ্যাসুন্দর প্রেমের কাহিনী, কাব্যে একখানি পূরো নভেল। বিদ্যাসুন্দরের প্রেমে স্বর্গীয়তা বা অলৌকিকতা কিছু নেই; সে প্রেম এই জগতের অতিবাস্তব বাসনা ও ক্ষুধার অভিব্যক্তি-তার গতি কখনও রঙ্গময় কখনও তত ন্যায়ানুমোদিত নয়। ভারতচন্দ্রের কাছে প্রেম, জীবনের একটি অতি রঙ্গভরা অভিজ্ঞতা এবং ভারতচন্দ্র রঙ্গরসটুকুর সমস্ত স্বাদ আমাদের আস্বাদনের জন্য রেখে যেতে ভোলেন নি। মনে হয়, ভারতচন্দ্রের কবিতা নারীর নগ্ন-মূর্ত্তির মত। কোন দেবীর নয়, সে অপ্সরীর নগ্ন-মূর্ত্তি। ভারতচন্দ্র কিন্তু তার কাব্যে প্রথাগত পৌরাণিক আবরণ দিতে ভোলেন নি। কিন্তু এমন কৌশলে তিনি দেবদেবীদের অবতারণা করিয়েছেন যে, দেবতার লীলা সাহিত্যের স্থলে এখানে একটি পার্থিব ব্যাপার সংক্রান্ত নাটক হয়ে উঠেছে। স্বয়ং একজন রাজার পুত্র এবং পলাশীর রঙ্গভূমির বিশিষ্ট অভিনেতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-কবি।

তিনি তাঁর সাহিত্যে তখনকার মুমূর্ষু আভিজাত্য সম্প্রদায়ের বাইরের চাকচিক্যময় জীবন ও তার সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ব্যাভিচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন।

কখন আনন্দময় কখনও তুচ্ছরঙ্গপ্রিয় কখন জ্ঞানী কখনও বা তিক্ত ব্যঙ্গময় কখন রসিক কখনও গম্ভীর ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর রক্তমাংসের মানুষটিকে এঁকেছেন। ভারতচন্দ্রের কবিতার মধ্যে কোথাও অস্পষ্ট বা রহস্যময় কিছু নেই—সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল।

ভারতচন্দ্রের যশ আজ মেঘে ঢাকা পড়েছে। ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে বিদ্যাসুন্দর গুরুপাক পদার্থ। বিদ্যাসুন্দরে আগাগোড়া একটা নৈতিক অবনতি ও নষ্টজীবনের ছায়া অতি সূক্ষ্ম ও স্পষ্টভাবে আছে—যেটা আজকালকার পাঠকের মনে একটা বিশ্রী অসোয়াস্তির সৃষ্টি করে। একথা আমি নিশংসয়ে স্বীকার করি যে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর fleur de mal হতে পারে কিন্তু তবু সে ফুল, অতুলনরূপ—পাপ্‌ড়িতে পাপ্‌ড়িতে ভরা। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে এমন কোন বই নেই যা সাহিত্যহিসাবে বিদ্যাসুন্দরের সমকক্ষ হতে পারে। এক-

মাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কোনও বাংলা কবি ভাষা ও ছন্দের উপর এমন অসামান্য অধিকার দাবী কর্‌তে পারেন নি। কাব্যের ব্যবহারিক কৌশলের দিক দিয়ে মনে হয়, এমন কি ফ্রান্সের নূতন কবিদের মধ্যে কেহ ভারতচন্দ্রের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দাবী কর্‌তে পারেন না। আমি জানি আজকাল technique বা ব্যবহার-কৌশলের প্রতি সাধারণের একটা বিতৃষ্ণা এসেছে। এবং তাঁরা ভাবেন যে, ওটা একটি নিষ্প্রয়োজন যন্ত্রবিশেষ। কিন্তু আমার মনে হয় যে, আজকাল আমরা একাগ্র পরিশ্রম দিয়ে যে জিনিষটার সৃষ্টি হল, তার মূল্য দিই না। আমরা এমনি ছুটে চলেছি যে, চিরস্থায়ী কিছু তৈরী কর্‌বার বা ভাববার সময় বা অবসর আমাদের নেই।

ভারতচন্দ্রের ভাষার কথা বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয় যে, তার তুলনায় স্বচ্ছসুন্দর অবাধ ভাষা সারা বাংলা সাহিত্যের মধ্যে আর কোথাও নেই। ভারতচন্দ্রের আগে আমরা জান্‌তাম না যে, আমাদের ভাষাকে কতরকম ভাবে কতদিকে নোয়ান যায়। ভারতচন্দ্র এসে বাংলাকে ইচ্ছামত ছাঁচে ঢেলে এমন মূর্ত্তি দিয়ে গেলেন যা রূপে ও রেখায় ও সৌষ্ঠবে অপরূপ। ভাষাকার হিসাবে ভারতচন্দ্র চিরদিন বাংলা সাহিত্যিকদের গুরু হয়ে থাকবেন। তিনি যে শুধু কবি ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন সেই সময়কার একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধীমান্ পুরুষ। তিনি এই পৃথিবী ও তার রীতিনীতির বিষয় তাঁর পূর্ব্ব কবিদের অপেক্ষা বেশী জান্‌তেন। তিনি সেই সময়কার উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার ও বিপ্লবের এমন তীব্র করুণ প্রতিচ্ছবি এঁকেছিলেন যা স্পষ্ট বলে দিয়েছিল যে, বাঙালীকে যদি বেঁচে থাক্‌তে হয়, তা হলে নতুনের জন্য পুরাতনকে সরে দাঁড়াতেই হবে। অপূর্ব্ব সরল সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ভারতচন্দ্র শিবের আহ্বানে লিখেছিলেন,—

"নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।"

তাঁর প্রার্থনা ভগবান শুনেছিলেন। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই পলাশীর যুদ্ধ হয় এবং ইংরেজ বিজয়ী হয়ে বাংলায় পদার্পণ করে।

(ক্রমশ)

---

* শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অনূদিত।

মৃত্যুঞ্জয়

—শ্রীযুবনাশ্ব।

খেঁদি-পিসীর পটলডাঙ্গার দল যখন পথে ভিক্ষে কর্‌তে বেরুত, তখন দলে একটিও পুরুষ থাক্‌ত না বটে, কিন্তু তাদের আস্তানার অন্ধকূপগুলির বাসিন্দা শুধু ঐ মেয়ে ক'টিই ছিল না। দু'একজনের ঘরছাড়া প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই দুটি একটি ক'রে পুরুষ থাক্‌ত। পথে বেরোন ছাড়াও তাদের অন্য রোজগার ছিল। রাত-বিরেতে পকেটকাটা অথবা ছোটখাট চুরিচামারি করা—অবশ্য এ'সব আয়ের কথা প্রায়ই দলে ফাঁস করা হ'ত না। মোড়ল তাদের খেঁদি।

চঞ্চু থাক্‌ত ক্ষ্যান্তর ঘরে। বিশেষ যে কোন সম্পর্ক ছিল তা নয়। বছর চারেক আগে সে ক্ষ্যান্তর ভাই-পো পরিচয় দিয়ে এসে দলে ভর্ত্তি হয়। ক্ষ্যান্ত, খেঁদির ডান হাত। কাজেই, খেঁদির বিশেষ ইচ্ছে না থাক্‌লেও ক্ষ্যান্তর অনুরোধ ঠেল্‌তে না পেরে তাকে নিয়ে নেয়।

পটলডাঙ্গার দলের পুরুষগুলো নামকরা। ও-তল্লাটে অমন বদ্‌মাইস, হৃদয়হীন জানোয়ার আর কোন দলেই ছিল না। দলের সেরা লোক ঐ চঞ্চু। সে না পারত এমন কাজই নেই। তার এই গুণের জন্যেই খেঁদি তার ওপর খুশী ছিল। তা না হলে এতদিন তাকে পথ দেখ্‌তে হত।

একবার সে বাইরে রাত কাটাতে গিয়ে ভিন্‌-দলের এক মেয়ের কান কেটে নিয়ে এসেছিল। মেয়েটা নাকি তার কি প্রস্তাবে আপত্তি করেছিল, তাই। আর একবার, পথে একটা ছোট ছেলের গলার হার ছিনিয়ে নিতে গিয়ে সে তার চোখ দুটো আঙুলে টিপে গেলে দিয়েছিল। পটলা স্বচক্ষে দেখে এসে খবর দেয়। সে-রাতে চঞ্চুর আদরের আর সীমা ছিল না।

এ হেন চঞ্চু যখন একদিন ময়লা, রোগা ও বোবা এক ছুঁড়ীকে নিয়ে এসে দলে ভর্ত্তি ক'রে নেবার সুপারিস্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল, তখন সবাই অবাক হয়ে গেল। ছুঁড়ী দেখ্‌তেও এমন কিছু নয়, আর তার সাথে চঞ্চুর ভাবের কথাও আগে কিছু

জানা যায় নি। কোথায় যে তার দরদ ঠাহর কর্‌তে না পেরে সবাই আরো অস্থির হয়ে উঠ্‌ল।

ছুঁড়ী ত ভর্ত্তি হয়ে গেল। রোজ সবায়ের সাথে পথে বেরোয়। ক্ষ্যান্তর ঘরখানা ছিল বড়, সেই ঘরেই থাকে। যতক্ষণ সে ঘরে থাকে, চঞ্চু তার খবরদারী করে। অন্য কোনো পুরুষের সাথে মিশ্‌তে দেয় না। নিজেও সে কাজে বেরোন অনেক কমিয়ে দিলে।

হরিমতীর ঘরের রতন একদিন তাকে বল্‌ল—কোত্থেকে এক বেটীকে জুটিয়েচিস্‌ চঞ্চু, তুই যে ব'য়ে গেলি!

চঞ্চু তার কথায় কান না দিয়ে বল্‌ল,—জ্বালাস্‌ নে রত্‌না, নিজের কাজ দেক্‌গে যা!

—বাবাঃ এযে কেউটে সাপ! বলি ফোঁস্‌ ক'রে ত এলি, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি বল দিকি! বলি বাঁধিয়ে বসেচিস্‌ কিছু? কিন্তু তুই ত সে পাত্তর নোস্‌! অমন কত বাঁধিয়েচিস্‌, কিন্তু নিজে ত কখনো এমন বেঁধে পড়িস্‌ নি!

চঞ্চু তাকে ধমক দিয়ে বল্‌ল, চুপ র' হতভাগা! আমি যা করি না-করি তোর তাতে কি রে? ফের্‌ যদি যা-তা বল্‌বি অমন, তবে—, জানিস্‌ ত চঞ্চুকে—

রতন বিলক্ষণই জান্‌ত, তাই আর না ঘাটিয়ে স'রে পড়ল।

সে স'রে পড়্‌ল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা এখেনেই চাপা পড়্‌ল না। চঞ্চুর আর আগের মতো ফুর্ত্তি নেই। পথে বেরোন ত ছেড়েচেই, রাত-বিরেতে রোজগারও আর কর্‌তে চায় না। দিন-রাত ঘরে ব'সে থাকে। ছুঁড়ী ফিরে এলে তাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়, রাত্ত বারোটা একটায় ফেরে।

এ সব খেঁদির চোখ এড়ায় নি। কিন্তু সে মুখ বুঁজেই ছিল। একদিন ব্যাপারটা এতদূর গড়াল যে, আর চুপ ক'রে থাকা চল্‌ল না।

সন্ধ্যেবেলা পটলা এসে বল্‌ল যে, সে রোজগারের মৎলবে ঘুর্‌ছিল। একটা মেয়ের হাতের বালার ওপর তার নজর ছিল। বালাটা ছিনিয়ে নিতে গিয়ে সে তার একটা আঙুল মুচ্‌ড়ে ভেঙে দেয়। চঞ্চু কোত্থেকে দেখ্‌তে পেয়ে এসে তাকে ঠাস্‌ ঠাস্‌ ক'রে দুটো চড় কসিয়ে দিয়েচে।

খবর শুনে দলের স্ত্রী-পুরুষ সবাই খাপ্পা হয়ে উঠ্‌ল। সকলে মিলে খেঁদিকে ধরে পড়্‌ল,—এর একটা বিহিত কিন্তু তোকে আজই কর্‌তে হবে পিসী! নইলে সব যে যেতে বসেচে! ড্যাক্‌রার কি যে হয়েচে কদিন থেকে—সাধুগিরী ফলাতে সুরু করেচে!

খেঁদিও কারো থেকে কম চটে নি। চঞ্চু ফিরবা মাত্র সবাই তাকে নিয়ে পড়্ল।

— বল্ মুকপোড়া, তুই ভেবেচিস্ কি ? দলের নাম ডোবাতে বসেচিস্ যে !

চঞ্চু কোনো জবাব দিল না।

একজন বল্ল,—আরে ও তো আর এমোন ছেল না! ওই শুঁট্কী মাগী এসেই ত ওকে বিগ্ড়েচে! ওকে না তাড়ালে চঞ্চুকে ফেরাতে পার্বি না—

খেঁদি বল্ল, সত্যি করে বল তুই, ও-মাগী তোর কে ? আমি কেন, দশজনে দেক্চে, ও-ই তোকে সার্চে ! ও কে তোর ?

চঞ্চু মুখ তুলে দেখ্ল সেও এসেচে। সে তার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট ক'রে বল্ল,—ও, আমার বোন্।

দলের মধ্যে দু'জনা পট্ পট্ মরে গেলেও কেউ অত আশ্চর্য্য হত না। বোন্? খেঁদির দলে বোন্? মা-বোনের ছোঁয়াচ ত ঢের দিনই এড়িয়ে আসা গেচে !

খেঁদি বল্ল, কোতা পেলি তুই ওকে ?

চঞ্চু বল্ল, রোজগারের মৎলবে শেয়ালদা গেছ্নু। এক কোণায় ও হাত পেতে দাঁড়িয়েছেল। এক ভদ্দর লোক ওর হাতে একটা পয়সা দিয়ে গেল। তাই দেকে, বেলেঘাটার মাণ্কে এসে সেটা তুলে নিয়ে ছুট্ মারুতে যেতেই ধাক্কা খেয়ে ও পড়ে গেল। কিন্তু তাজ্জব হলুম দেকে যে, একবারও কাৎরাল না ! এগিয়ে এনু। দেকি যে, দু'চোক দিয়ে জল পড়্চে কিন্তু মুকে রা'টি নেই ! স'ন্দ হল, বোবা নাকি ? শেষে দেকনু তাই। সাথে ক'রে নে' ভিড় কেটে বেরিয়ে এনু। তা ওকি আসে ? চোকের দিকে তাকিয়ে বুঝ্নু আমায় বিশ্বেস কর্চে না। বলনু, আমায় সন্দ কোরো না, আমি তোমার ভাই। ও খানিক ভেবে আমার সাতে চলে এল। তা' পর এনে দলে ঢুকিয়ে দিইচি !

—কিন্তু তুই দিনকে দিন অমন ম্যাদামরা হয়ে যাচ্চিস্ ক্যানো ? রোজগারে বেরোস্ না যে আজকাল ?

—ভাল লাগে না।

রতন তাড়ি খেয়ে এসেছিল। হাতে তখনো গাঁজার কল্কে। একধার থেকে টেনে যাচ্ছিল। চঞ্চুর জবাব শুনে কল্কে নামিয়ে বল্লে—কি বাবা সোনার চান্—ভালো লাগে না ? হুঁম্! বাবা, পিরীত বাঁধিয়েচ, সে কথা বল্লেই হয় ?—আচ্ছা সত্যি ক'রে বল্ দিকি, কি রস তুই পেলি ওর মধ্যে—

রতনের মুখের কথা মুখেই রইল। চঞ্চু তড়াক্ ক'রে এক লাফ দিয়ে তার ঘাড়ের ওপর পড়ে দোহাত্তা কীলচড় মেরে যেতে লাগ্‌ল।—মুখ সাম্‌লে কথা কইতে জানিস্ নি শুয়ার—বল্‌বি আর—বল্‌বি—বল্‌বি—

সবাই হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এসে ছাড়িয়ে দিল। কিন্তু রতনের আর বস্‌বার অবস্থা ছিল না। ভুঁয়ে পড়ে গড়াতে লাগ্‌ল।

খেঁদি অবাক্ হয়ে দেখ্‌ছিল। তারই চোখের ওপর চঞ্চুর যে এতটা সাহস হবে তা সে ভাবে নি। হোক না চঞ্চু দলের মধ্যে সব চেয়ে তুখোড়—সব চেয়ে নামজাদা। তা বলে মোড়ল ত সে-ই।

খেঁদি বল্‌ল,—শোন্ চঞ্চু, এই তোকে বল্‌চি—ও মাগীকে তোর ছাড়তে হবে। যেখান থেকে ওকে কুড়িয়ে পেয়েচিস, কাল গে' সেই খেনে রেকে আস্‌বি, নইলে—

চঞ্চু খেঁদির দিকে তাকাল।

—নইলে তোকেও দল ছাড়তে হবে। আগেকার মতো যদি হতে পারিস্, তবে ঢুক্‌তে পাবি, নইলে আর নয়। বুঝেচিস ?

চঞ্চু চুপ ক'রে শুনল। হাঁ না কিছুই বল্‌ল না। খানিক পরে বোবা মেয়েটার হাত ধরে উঠে ঘরের দিকে চলে গেল।

যে যার নিজের নিজের গর্ত্তে ঢুকে পড়্‌ল।

ভোর রাতের আবছা আলোয় দুটি লোক খেঁদির আস্তানা থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়্‌ল।

সকালবেলা চঞ্চুর সেই ছুঁড়ীটাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না! সেদিন গেল, তার পর দিন,—তা'পর অমন কত দিন চলে গেল, কিন্তু তাদের কোনো হদিস্ আর মিল্‌ল না।

রতন টিপ্‌নী কাট্‌ল,—বলেছিনু কি না। শক্ত একটা কিছু বেঁধেচে বাবা। নইলে চঞ্চুর মতো স্যায়না ঘাগী—

* * *

হৃদয়হীনের হৃদয়—মরুভূমির আকণ্ঠ তৃষ্ণার মধ্যে ছোট জলাশয়ের মতো। শুকিয়ে যাবার সম্ভাবনাই ষোল আনা। যদি না যায়, তবে তৃষাতুরকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে।

বন্ধ্যা

—শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী।

সৌদামিনীর বিয়ে হ'য়ে গেল।

ক'নের বাড়ীতে সকলে বল্লে, 'দিব্যি সুপাত্তর, যেমন রূপ তেম্নি গুণ, এরি মধ্যে তিন-তিন্টে পাশ করেছে!

বরের বাড়ীতে ক'নেকে দেখে সবাই বল্লে যেন জগদ্ধাত্রী; একেবারে ঘর আলো ক'রে এলো!

*   *   *   *

বছর দুই হ'য়ে গেছে।

সৌদামিনীর শ্বশুর-বাড়ীর কারো মনে স্বস্তি নেই। তার শাশুড়ী পদ্মাবতী, নাতি কোলে কর্‌বার জন্যে আকুল। কত মাদুলী, কত ওষুধ বৌকে পরালেন, খাওয়ালেন কিছুতেই কিছু হল না। 'নাতি স্বর্গে বাতি' কিন্তু তাঁর নাতিও হল না, অতএব স্বর্গের পথও অন্ধকার এই ভেবে তিনি বড় ক্ষুণ্ণ হলেন।

নিজের পাড়া-প্রতিবাসীর কাছে পদ্মাবতী ব'লে বেড়ালেন যে, বউ বন্ধ্যা।

বাইরে সৌদামিনী লজ্জিত হতে লাগ্‌ল। ওর দিকে সকলেই চেয়ে একটু হাসে। যার ছেলে আছে সে একটু গর্ব্ব ক'রে হেঁটে চলে।

*   *   *   *

আবার একদিন ওবাড়ীতে সানাই বেজে উঠ্‌ল। পদ্মাবতী স্বর্গের বাতি আন্‌বেনই আনবেন, তাই ছেলের আবার বিয়ে দিচ্ছেন।

*   *   *   *

সৌদামিনী আগেই বাপের বাড়ী চলে এসেছে। যিনি সৌদামিনীকে ছেলেবেলা কোলে ক'রে মানুষ করেছিলেন, তিনি আবার সৌদামিনীকে বুকে ক'রে বর্ষার মেঘের ন্যায় অঝোরে অশ্রু ফেল্‌লেন।

*   *   *   *

হঠাৎ একদিন সৌদামিনীকে পাওয়া গেল না। খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে বাড়ীর কাছেই এক পুকুরে তার মৃতদেহ পাওয়া গেল।

ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে বল্‌লেন, 'গর্ভলক্ষণ।'

* * * *

সৌদামিনী বন্ধ্যা ব'লে শ্বশুর-বাড়ী থেকে বিদায় নিয়েছিল, আর আজ বন্ধ্যা নয় ব'লে তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হল।

এত দিন ধ'রে যে ভুল ক'রে এসেছি তাকে ত আর শোধ্‌রাবার সময় নেই, কিন্তু তাতে কি, যাবার আগে যে আমার ভুল বুঝ্‌তে পেরেছি এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ, এই ধরণীর পুষ্পগন্ধ ভাবের সৌরভের সন্ধান যে জেনেছি, তাতেই আমি ধন্য . . .

"মেঘের হাসি"

দুই দিন

—শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়।

সন্ধ্যার আঁধার কালো পাথরের মত পৃথিবীর বুকে চেপে বস্‌ল। একখণ্ড সাদা কুয়াসা সে কালিমার উপর মুহূর্ত্তের মধ্যে মরণের পাণ্ডুরতা লেপে দিল, মাথার উপর অর্দ্ধেকের বেশী চাঁদ একটু একটু ক'রে উঠে এল। মৃতের চোখ যেন কে জোর ক'রে মেলে দিয়েছে, তার সেই কলঙ্ককালিমাময় মুখের জ্যোতি-শূন্য ভাষাহীনতা পৃথিবীর বুকে এলিয়ে পড়্‌ল! ট্রেঞ্চের ভিতরে শীতে আড়ষ্ট সৈনিকেরা প্রকৃতির সেই মৌন উপেক্ষায় যেন মুশ্‌ড়ে গেল।

সবাই মাথার উপর দূরবীক্ষণ লাগিয়ে চেয়ে দেখ্‌ছে—জার্ম্মান এরোপ্লেন হয় ত কোথায় ঘুর্‌ছে—টপ্‌ করে মাথার উপর বোমা ফেল্‌বে, একজন প্রৌঢ় সৈনিকও তা'দের মধ্যে ছিল।

একবার ভাবল কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই অধীনতার সহস্র নিগড়ে আপনাকে সে বেঁধে রেখেছে। কোথায় তার সুদূরের সেই ইংরেজ পল্লী আর কোথায় এই ফ্রান্সের রণক্ষেত্র! নূতনত্বের যে এক বিরাট আকাঙ্ক্ষা মানুষকে বসে থাক্‌তে দেয় না—সেই তাকে আত্মীয় স্বজনহীন এই দূরদেশে এনে ফেলেছে। বড় একটা কিছু কর্‌বার আশা সে কোনদিন করে নি।

অনেকদিন সে গোলাগুলির ভিতর দিয়ে এসেছে; কিন্তু আজ হঠাৎ এই প্রান্তরের পরিখায় মনটা যেন একটু শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ল! সমস্তদিন তা'রা এরই মধ্যে ছিল—সম্মুখে শত্রুরাও পরিখা আক্রমণ করবার অপেক্ষা কর্‌ছিল। সমস্তদিন সে বিরাট প্রান্তরের অসীম শূন্যতা তার মনে কিছু ভাব আনে নাই।

বাস্তবিক দিনের আলো যেখানে কল্পনার জাল বোনে—রাত্রির অন্ধকার সেখানে ভয়ের পাষাণ চাপায়। এর অর্থ কি—একি শুধু মানুষের একটা মিথ্যা দুর্ব্বলতা—আজন্মার্জ্জিত একটা ভুল সংস্কার, না অন্ধকারের অসীম শূন্যতা? এর মধ্যে আরো কিছু আছে। আলোকে মানুষ জানে, কিন্তু আঁধারকে সে জানে

না—বোঝে না। সৃষ্টির প্রথম হ'তে সে আঁধারকে বোঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে—কিন্তু যুগের পর যুগ সে পরাজিত হয়ে এসেছে। জীবনের আলো যখন মৃত্যুর আঁধারে লুকিয়ে যায়, মানুষ তখন সবজানার চেয়ে অজানার মধ্যে গিয়ে পড়ে। রাত্রির আঁধার তার সেই পতনের চিরবর্ত্তমান সাক্ষী—তাই না তাকে এত ভয়।

হঠাৎ বাঁ-দিকে ফস্‌ করে একটা আলো জ্বলেই নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিরাট শব্দে ট্রেঞ্চের খানিকটা একেবারে বিধ্বস্ত হ'য়ে গেল। শত্রুপক্ষের এরোপ্লেন আলো লক্ষ্য ক'রে বোমা ফেলেছে, এক বেচারী সৈনিক এই শীত রাত্রিতে সিগারেটের লোভ সামলাতে পারে নি। উপর্য্যুপরি গোলাবর্ষণ হতে লাগ্‌ল—মুহূর্ত্ত মধ্যে অর্ডার হ'ল ট্রেঞ্চ বদ্‌লাতে হ'বে।

নূতন ট্রেঞ্চে এসে সব একেবারে চুপ। কারো মুখে কথাটি নেই। পাশাপাশি অনেক প্রাণী—কিন্তু কারো সঙ্গে কারো আলাপ নেই! এই কুয়াশামাখা বীভৎসতার মাঝ্‌খানে এরূপভাবে থাকা কি বিশ্রী! এ যেন আশাহীন ভাষাহীনভাবে এ 'কিছু-না'র জন্য জেগে থাকা—এর শেষ নেই। উদ্দেশ্যহীনতার দারুণ অভিজ্ঞতা নীরব অপেক্ষাকে আরো অনেক দুর্ব্বিসহ ক'রে তোলে!

কুয়াশা খুব একটু বেশী ক'রে চেপে বসল—জেনারেল ভাবলেন, প্রকৃতি তাঁর সহায়। একটু একটু জল পড়্‌তে লাগল, তা' বৃষ্টির কি কুয়াসার বোঝা গেল না। জেনারেল সৈনিকদের ট্রেঞ্চের উপর আস্‌তে হুকুম দিলেন। প্রৌঢ় সৈনিক সমস্ত দিনের মধ্যে এই মুক্তির আনন্দটুকুকে উপেক্ষা করতে পার্‌লেন না, তার সঙ্গে আরো অনেকে বেরিয়ে এল।

একসঙ্গে পট্‌ পট ক'রে অনেকগুলি শব্দ হ'য়ে গেল। এপাশে ওপাশে অনেক-গুলি লোক প'ড়ে গেল। কুয়াশাজাল ভেদ ক'রে দূর-আকাশের বুক আগুনের রঙে জ্বলে উঠেছে—উপর হতে নানারূপ লাল নীল আলোকের খেলা কুয়াশার বুকে মায়া রচনা করল্‌। পিছন হতে সাঁ ক'রে দুই 'হাউট্‌জার' থেকে গোলা উঠল কল্পলোকের সে মায়াকে গ্রাস করতে।

জেনারেল অর্ডার দিলেন—Lie in load—aim—fire... সহস্র রাইফ্‌ল এক-সঙ্গে গর্জ্জে উঠ্‌ল—সহস্র বেয়োনেট চন্দ্রালোকের সুধা পান ক'রে নেচে উঠ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে জার্ম্মাণ সৈন্য কাছে এসে পড়ল। দুইদিকে অসংখ্য গোলা-গুলি বৃষ্টি চচ্ছিল। অবশেষে দু'-দল বড় বেশী কাছাকাছি হয়ে পড়ল—বেয়োনেট অনিবার্য্য। ভবিষ্যৎ যুদ্ধের রক্তপাতের কথা মনে হ'য়ে প্রৌঢ় সৈনিক শিউরে উঠ্‌ল। যুগের পর যুগ মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে চেয়েছে—কিন্তু পারে নি।

আর আজ কিনা সে নিজে মাথা পেতে সে পরাজয় স্বীকার কর্‌ছে—মানুষকে তার বাঁচ্‌বার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত ক'রে।

যুদ্ধ আরম্ভ হল। চারিদিকে মারামারি কাটাকাটি, উপরের এরোপ্লেন সমূহের বহু বর্ণ আলো চোখে মুখে মরণের জিঘাংসা জাগিয়ে তুল্‌ল। ব্যাণ্ডের শব্দ ধমনীর রক্ত নাচিয়ে দিল, বেয়োনেটের এক এক ঘায়ে এক একজন পড়্‌ছে! প্রৌঢ় সৈনিক দেখ্‌ল তার পাশের লোকটি প'ড়ে গেল, একটা বেয়োনেট তার নিজেরই বুকের উপর উঠেছে! এক মুহূর্ত্তে পাশ ফিরে সে চার্জ্জ করল, জার্ম্মান বুকে হাত দিয়ে প'ড়ে গেল। সৈনিক যুবক, চোখে মুখে দীপ্তি তখনও ভরা ভরা।

মাথার উপর নিশীথের চন্দ্র তখনও তেমনি ভাবে জ্বল্‌ছিল।

* * * *

ছোট্ট কুঠরির ছোট্ট জানালার সামনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্দ্দা ঝুল্‌ছিল। সমস্ত-গুলি তার্পিন তেলে ভেজা। ভিতরে দুইটি প্রাণী, বিছানায় একখানা পরিষ্কার চাদর। একটি যুবক, বয়স বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে হ'তে পারে। তারই পাশে বসে এক বৃদ্ধ, মাথায় তা'র এক রাশ সাদা চুল।

সমস্ত ঘরে একটা বিশ্রী গাম্ভীর্য্য— টেবিলের উপর একটা মুখঢাকা "স্পিটন", এক কোণে আর একখানা টেবিলের উপরে অনেক রকম ছোট-বড় ঔষধের শিশি। যুবক যক্ষ্মারোগে অস্থিচর্ম্মসার হয়ে গেছে! কিছু আর তার শরীরে ছিল না। ব্যারামের বিরাট বুভুক্ষা দিনের পর দিন তাকে চুষে খেয়েছে।

আচ্ছা, কত দিন চল্‌বে আর মানুষের উপর রোগের এই বিপুল বিজয় অভিযান? মানুষ দিনের পর দিন বিরাট যন্ত্র আবিষ্কার করে—আকাশের বিদ্যুৎ, সাগরের জল নিয়ে খেলা করে—পৃথিবীর বুক যন্ত্রের ভারে পীড়িত হয়ে উঠে কিন্তু কি এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণু মানুষকে অব্যবহার্য্য ক'রে তুলেছে। মানুষ কবে আর একে জয় কর্‌বে?

বৃদ্ধ, যুবকের পিতা। গত যুদ্ধে সে মরে নি, কিন্তু মরণের পথে অনেকটা এগিয়ে গেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে সে ছিল বয়সে প্রৌঢ়, উৎসাহে যুবক সৈনিক, আর এখন সে বয়সে প্রৌঢ়, মনে ও দেহে বৃদ্ধ। এক দৃষ্টে পুত্রের মুখের দিকে চেয়েছিল। যুবক চোখ বুজে রয়েছে, হঠাৎ ডেকে উঠ্‌ল—'বাবা!'

কেন—?

আজকে নূতন বৎসরের প্রথম দিন, না?

হাঁ বাবা।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে যুবক ব'লে উঠ্‌ল, মা কোথায় ?

এই তার প্রথম ভুল কথা। তার মা অনেক দিন আগেই চ'লে গিয়েছিল। দুই ফোঁটা অশ্রু তার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়্‌ল।

বাবা, আমি আবার ভাল হয়ে নূতন বছরের আমোদ করব্‌।

হাঁ বাবা, তাই করো। এখন একটু সিরাপ খেয়ে নাও, কেমন ?

উত্তর নেই। একটি চাম্‌চে ক'রে লাল বর্ণ সিরাপ দেওয়া হল—কিছুতেই খাবে না···অনেক কষ্টে একটু গলায় ঢেলে দিল, দু তিন বার চেষ্টা ক'রে খেল!

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ ব'লে উঠল—তোমরা কি আমায় বিশ্রাম দেবে না, বাবা ?

বিশ্রাম!—বিশ্রাম কোথায় ? এই বিরাট কর্ম্মকোলাহলময় জগতে বিশ্রাম কোথায় ? চলা—শুধু চলা, বালক যুবক হয়, যুবক বৃদ্ধ হয়, সৃষ্টি বিনাশের কোলে গড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে কি বিশ্রাম আছে ? ঊষার আলো দিনের সৃষ্টি করে, রাত্রির আঁধার সন্ধ্যার সমাধি দেয়; মানুষ মানুষকে সৃষ্টি করে, মৃত্যু তাকে কেড়ে নেয়—এ তো চিরকাল চল্‌ছে, এর বিশ্রাম নেই।

বৃদ্ধ পিতা কেঁদে ফেল্‌ল। দু'হাতে নিজের প্রিয়পুত্রকে জড়িয়ে ধর্‌ল। সে তিন চার বার কেশে ফেল্‌ল—লক্ষ জীবাণু ছড়িয়ে পড়্‌ল কিন্তু কে তাকে ভয় করে ?

যুবক হঠাৎ পা দু'খানি টেনে উঁচু করল, ভীষণ ভাবে তা' কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। বৃদ্ধ হু হু ক'রে কেঁদে পুত্রকে আরো জোরে চেপে ধর্‌ল।

যুগের পর যুগ মানুষ জীবন-পথের খেই হারিয়ে অবশ হয়ে পড়ে—একদিকে টানে তাকে মৃত্যু, অন্য দিকে মানুষ।

আমি বাঁচ্‌তে চাই বাবা।

বাঁচ্‌তে চাও তুমি ?—কে বাঁচ্‌তে না চায় ? কিন্তু মানুষ আজও মৃত্যুর হাতে খেলার পুতুল। একটা উচ্ছৃঙ্খল খেয়ালহীন দুর্দ্দান্তের মত সে তোমার দোরে উপস্থিত হয় তার বুভুক্ষা নিয়ে। তোমার বুকের রক্ত দিয়ে তা মেটাতে হবেই, এর উপায় নেই। মানুষ পার্‌ছে না, একেবারে পার্‌ছে না মৃত্যুর সাথে।

বৃদ্ধ পুত্রের বুকের উপর প'ড়ে রইল। বাইরে কুয়াশা। আকাশে চাঁদ উঠেছে কিন্তু চাঁদের সে আলো আঁধারের চেয়ে বীভৎস, তাতে বোঝ্‌বার, পাবার

কিছু নেই। আর তিন বৎসর আগে ফ্রান্সের সেই যুদ্ধক্ষেত্রের কথা মনে হ'ল। সেদিনও, এমনি মরণ তালে তালে নেচে আস্‌ছিল!

বুকের কাপড় সে সরিয়ে ফেল্‌ল, প্রত্যেকটি হাড় গোণা যায়, নিশ্বাস প্রশ্বাসের দারুণ অভিনয় সেখানে চল্‌ছিল। হাত ধ'রে দেখ্‌ল নাড়ী ঘণ্টায় একশ' বিশ বার চল্‌ছে। সমস্ত শরীরে মরণের ছায়া, নিদ্রিত চোখদুটি দুটি কালো রেখার মত প'ড়ে রয়েছে! হাতের চামড়া বিবর্ণ, নাক একটু হেলে পড়েছে।

হঠাৎ সে চোখ খুলে চাইল—সে দৃষ্টি যেমন স্থির তেমনি উজ্জ্বল—বৃদ্ধ উৎফুল্ল হয়ে ডাক্‌ল—

বাবা—

নীরব।

বাবা—বাবা—আমার দিকে চাও।

কে কার দিকে চায়? সে দৃষ্টি বাবাকে দেখ্‌বার জন্য নয়, সে চোখের ক্ষুধা মানুষের মুখ মেটাতে পার্‌বে না। তা' মৃত্যুর অন্ধকারে অমৃত খুঁজ্‌ছে চিরকাল বেঁচে থাক্‌বার জন্যে।

বৃদ্ধের চোখের জলে যুবকের বুক ভিজে গেল। দুই হাতে সে তার মাথা নেড়ে দিল—শীর্ণ ঠোঁটের উপর চুমো খেল—কিন্তু সে চোখ দুটি স্থির।

বৃদ্ধ তার বুকের দিকে চেয়ে দেখ্‌ল—জীবনের স্পন্দন থেমে গেছে—বিকট চীৎকারে সে অজ্ঞান হয়ে পড়্‌ল।

বাইরে তখনও চন্দ্র বীভৎস ভাবে ঢুল্‌ছিল।

যতক্ষণ তুমি নারী, আমি পুরুষ, ততক্ষণ কেবলই হার-জিতের মোকদ্দমা!

"পাষাণ পুরী"

মানসী

—শ্রীদেবীদাস বন্দোপাধ্যায়।

মন যখন ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখের ছবি আঁকিতে বসে তখন সেই কাল্পনিক সুখ-দুঃখের মাঝে কাহার যেন একখানি আসন আপনা হইতেই পাতা হইয়া থাকে;

যাহার চিন্তা মনকে সর্ব্বক্ষণ আছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, কাজে-অকাজে দিবা-রাত্রি যাহার মায়াময়ী মূর্ত্তি মনকে উদাস করিয়া ফেলে—সে কে জানি না।

বহুদিন-বিগত-স্বপ্নের স্মৃতির মত অস্পষ্ট এক রহস্যময়ী মূর্ত্তি মনের মাঝে অনুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়ায় কিন্তু যখনই মনকে একাগ্র করিয়া তাহাকে সমগ্ররূপে স্পষ্টভাবে পাইবার প্রয়াস পাই তখনই সে আরো অস্পষ্ট হইয়া যায়। সে এমনি।

আমি চাহি না বলিলেও তাহার ছবি মন হইতে একবারে মুছিয়া যায় না—আবার যখন তাহাকে সমগ্রভাবে—সম্পূর্ণরূপে পাইতে চাই—স্পষ্টভাবে ধরিতে যাই—তখন সে তীব্র বিদ্যুৎ সঞ্চালনের মত ক্ষণিকের জন্য মনকে আলোড়িত করিয়া পরক্ষণেই ছায়াময় দূরে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়।

জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সর্ব্বপ্রথমে কবে এবং কিরূপে মন এক অপরিচিতার পরিকল্পনা করিয়াছিল জানি না, কিন্তু হঠাৎ একদিন নিজের প্রকৃত অবস্থা যখন প্রথম নিজের কাছে স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল তখন কি-জানি-কেন গভীর বিস্ময়ে ও ঔদাস্যে মন ভরিয়া উঠিয়াছিল।

বিগত জন্মের স্মৃতির মত, সুখ-স্বপ্নের আভাষের মত, সুদূর প্রিয়জনের চিন্তার মত—কার এ ছবি সময়ে-অসময়ে মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে?—কে এ? আকুল-বিস্ময়ে কতবার নিজেকে প্রশ্ন করিয়াছি—কে এ নারী? এই কৌতুকময়ী নারী-মূর্ত্তির আবেশময় চিন্তা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে অবাধ্য মনকে কতবার শাসন করিয়াছি—কতবার আপনাকে তিরস্কার করিয়াছি। কিন্তু বৃথা অনুশাসন। মন যে তখন নিজের অজ্ঞাতসারে কখন এই রহস্যময়ীর কাছে নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া বসিয়াছে! সে কেন এমন?

দিন যায়। বিরক্তির পরিবর্ত্তে এক মধুময় মাদকতা সমগ্র মনকে প্রকাশ্যভাবে অভিভূত করিতে লাগিল। প্রথমে যাহাকে ভুলিতে চাহিতাম—যাহার চিন্তা আসিলে নিজেকে জোর করিয়া নানা কাজে ব্যাপৃত রাখিবার চেষ্টা করিতাম—ক্রমে সে-ই যেন আমার সমগ্র জীবনকে—আগের সমস্ত অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বিস্ময়ের স্থান ভরিয়া গেল দুর্জ্জয় কৌতূহলে। ধ্যানের তন্ময়তাও যখন তাহার সমগ্র মূর্ত্তিকে মনের আশা পূরিয়া ধরিয়া দিতে পারিল না—তখন স্বপ্নময়ী কল্পনায় সে অভাব পূরণ হইয়া গেল। যাহা এতদিন নিজেকে অস্পষ্টভাবে অনুভব করাইত, ক্রমে কল্পনা তাহাকে গোলাপের রক্তরাগ, কুন্দের শুভ্রতা, চম্পকের উজ্জ্বলতা, জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা, সূর্য্যকিরণের তীক্ষ্ণতা, কুসুমের কোমলতা লইয়া স্পষ্ট করিয়া তুলিল!

সে কেমন—কেমন করিয়া বলিব? তাহার কথা যতটুকু যেমনভাবে বলিতে চাই ততটুকু ঠিক্ তেমন করিয়া বলিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না যে!

আমার প্রতি পাদক্ষেপে এক রূপময়ী নারী আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। আমার প্রতি কার্য্যে, আমার প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে সে তরুণী আমার অনুসরণ করিয়া চলে। তাহার ছায়া আমার নয়নে আসিয়া পড়ে, নয়নের আগে সে কখনও পড়ে না।

গভীর তিমিরান্ধ নিশীথে অনুভব করিয়াছি—আমারই অন্তরবাসিনী সেই ছায়ানারী যেন রাত্রির সহিত মিশিয়া রহিয়াছে—আমারই চারিদিকে। অন্ধকার যেন তাহার স্পর্শ। চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত রজনীতে তাহাকে দেখিয়াছি—জ্যোৎস্নার মৃদু কম্পনে তরুবল্লরীর আলোছায়ায়, ছায়াময় দূরে। রাত্রিকে আহ্বান করিয়াছি, জ্যোৎস্নাকে শত প্রিয় নাম দিয়া ডাকিয়াছি—সুদূরকে সুমিত্র বলিয়াছি, তবু সে নারী তেমনি রহিল। সে এমনি।

* * *

মন কাঁদিয়া মরে। আর বলে, হে চিরনারী, তোমার ছায়া আমার নয়নে আসিয়া পড়ে তবু তুমি আস না; বাতাস তোমার গন্ধ বহিয়া আনে—কোন্ দিক হইতে আনে তাহা বলে না।

চিরকাল কি গো এমনি রহিবে?

রাত্রির অতল অন্ধকারের সায়র ঈষৎ দুলিয়া উঠে। পাগল মন দীপ-শিখার মত তবু দুরন্ত দূরের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে—সে আসিবে! হয় ত সে আসিবে।

পান্থ-বীণা

—শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়।

১২

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একে ত' এই দীনতা প্রকাশের লজ্জায় বংশী এতটুকু হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর বিভার ঐ অভদ্র মন্তব্যটা তাহার কানে ঢুকিতেই একটা প্রচণ্ড আঘাত খাইয়া সে একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইল; কিন্তু যাহার প্রতি নজর পড়িবে ভাবিয়াছিল, তাহাকে সে দেখিতে পাইল না। পাইলে কি হইত বলা যায় না,—দেখিতে না পাইয়াই বরং সে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল।

বিভার কাছে চাহিবার দুর্ব্বুদ্ধি তাহার যেন না হইলেই ভাল হইত! পথ চলিতে চলিতে ঘৃণায় লজ্জায় বারে বারে শুধু সে নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগিল। সে ত' তাহাকে টাকা আনিতে বলে নাই, বরং মুখ হইতে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই পুনরায় তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু সে নির্ব্বোধ মেয়েটা যে এমন করিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার দিদির কাছে চাহিয়া আনিবে,—না বুঝিয়া তাহার এই দৈন্য-প্রকটিত মূর্ত্তিখানি প্রকাশ্য রাজপথে টানিয়া বাহির করিয়া দিবে, তাহা সে প্রথমে ধারণাই করিতে পারে নাই। আশার অতিরিক্ত বলিয়া ভিক্ষুক যদি দাতার অযাচিত দান পুনরায় দাতার হাতেই ফিরাইয়া দিতে চায়, তাহা হইলে তাহার মধ্যে দাতার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইবার মত এমন কি যে অহঙ্কার লুকাইয়া থাকিতে পারে এই কথাটাই সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। শীত প্রভাতের খর রৌদ্রতপ্ত পথের উপর দিয়া চলিতে চলিতে মনে মনে বারংবার সে নিজেকে বুঝাইতে লাগিল যে, এমন করিয়া নিতান্ত পরিচিতের কাছে করুণার ভিখারী হইয়া কোন দিন দাঁড়াইতে নাই!

বাড়ী ফিরিয়া তাহাকে বাজার করিতে হইবে! দিদি হয় ত' তাহার পথ

চাহিয়া বসিয়া আছে, হয় ত' বেলা হইয়া গেল, এই ভাবিয়া পথের পাশে একটা বড়বাড়ীর ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিল, দশটা বাজিয়া গেছে; অথচ যে কাজের জন্য আজ সে এত প্রত্যূষে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল, সে কাজ তাহার এখনও অসমাপ্তই রহিয়াছে।—একখানা গীতা না কিনিয়া সে আজ বাড়ী ঢুকিবে কোন্ মুখে?

বংশী আবার ফিরিল। বৌবাজার হইতে এইবার সে একটা বাঁ-পাশের গলি ধরিয়া হ্যারিসন রোডের দিকে চলিতে লাগিল; তাহার এক সহপাঠী বন্ধু নাকি সেখানে একটা মনোহারী জিনিষের দোকান খুলিয়াছে,—তাহারই সন্ধানে। কিয়দ্দূর গিয়া একটা কাঠ-গোলার সুমুখে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। পথের পাশে দুইটা কাক একটা মরা ইঁদুর লইয়া টানাটানি করিতেছিল। দাঁড়াইয়া দেখিবার মত সেখানে কিছুই ছিল না; তথাপি সেইদিক পানে তাকাইয়া মিনিট কয়েক্ চুপ করিয়া বংশী তদবস্থায় সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। বন্ধুর সন্ধানে তাহার আর যাওয়া হইল না,— যে পথে আসিয়াছিল, আবার সেইপথে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে বংশী পুনরায় বাড়ীর দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। তাহার এই অদ্ভুত খেয়াল অন্যের নজরে পড়িলে কে কি ভাবিত কে জানে, কিন্তু তাহার নিজের মনে আজ ইহা এতটুকু রেখা-পাতও করিল না। আন্‌মনে সে অনেকখানি পথ চলিয়া আসিয়াছিল, ফিরিবার সময় পথের দৈর্ঘ্য আর ফুরায় না দেখিয়া সে কথাটা একবার তাহার মনে হইল মাত্র। বৌবাজারের ফুটপাথে উঠিয়া বংশী একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইল। কিন্তু অনেকগুলা বড়বাড়ীর আড়ালে অমরেশের বাড়ীটা সেখান হইতে দেখিতে পাওয়া গেল না।

আপন মনে হাটিতে হাটিতে বংশী যখন তাহাদের গলির মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল, সূর্য্যরশ্মির প্রখরতায় বেলা তখন অনেক বেশী হইয়াছে বলিয়াই বোধ হইতেছিল। তামাকের দোকানের ঘড়িটা সেখান হইতে ভাল দেখা যাইতেছিল না, বংশী একটুখানি কাছে গিয়া দেখিল, এগারটা বাজিতে তখন মিনিট পাঁচেক বাকি। এখনও তাহাদের বাজার হয় নাই!...তাহার মনে হইল, সব ঘড়িগুলাই ভুল, নিশ্চয়ই এখনও এত বেলা কখনও হইতে পারে না! কিন্তু তাহাদের সে-গলির রাস্তায় বাহিরের ঘরে বা দোকানে আর কাহারও ঘড়ির বালাই ছিল না,—অগত্যা তাহাকে চোখ-কান বুজিয়াই তাহার ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। দরজায় খিল বন্ধ ছিল না, একখানা কবাট ঈষৎ ফাঁক করিয়া দেখিল, উঠানের রৌদ্রে একখানা আসনের উপর বাবা তাহার দরজার দিকে পিছন

ফিরিয়া বসিয়া আছেন ; রান্না ঘর হইতে দিদির রান্নার শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। চোর যেমন করিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে গৃহস্থের ঘরে প্রবেশ করে, বংশীও তেমনি ভাবে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়াই দরজার খিলটা ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া দিল। উঠান পার হইয়া সে বারান্দায় উঠিতে যাইবে এমন সময় পদশব্দে সচকিত হইয়াই বোধ করি রত্নেশ্বর মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বংশীকে দেখিতে পাইয়াই সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, এই যে! এই যে বাবা, এই ত্থাখ্—এই শোন্ শ্রীভগবানের উক্তি! আমি যে ডাক্‌লাম, দু'বার,—দু'বার কেন, তিন বার ডাকলাম। এই ত্থাখ্—এই শোন্—বলিয়া তিনি যে বস্তুটি হাত দিয়া তুলিয়া দেখাইলেন, এতক্ষণ সেদিকে বংশীর নজর পড়ে নাই। স্বপ্নে যাহা সত্য ছিল না, অকস্মাৎ ঘুম ভাঙিবামাত্র তাহাই যদি কেহ চোখের সুমুখে সত্যই ঘটিতে দেখে, তাহা হইলে বিস্ময়ে সহসা যেমন তাহার বাকরোধ হইয়া যায়, রত্নেশ্বরের হাতে লালরঙের নূতন গীতাখানা দেখিয়া বংশীর অবস্থাও ঠিক তেমনি হইয়া গেল,—মুখ দিয়া তাহার একটি কথাও বাহির হইল না।

বইখানা খুলিয়া তাহার কি একটা শ্লোক রত্নেশ্বর তাহাকে পড়িয়া শুনাইতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বংশীর সে রৌদ্রদগ্ধ রুক্ষ মলিন মুখখানির দিকে তাকাইয়া হঠাৎ তিনি সে কথা ভুলিয়া গিয়া আপন মনেই বিড় বিড় করিয়া বকিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার এক সময় বলিয়া উঠিলেন, এখন এই নাওয়া-খাওয়ার সময়। তখন যে তোকে ডাকলাম, তুই এলি নে। এই বলিয়া তিনি একবার রান্না ঘরের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, হ্যাঁ মা গায়ত্রী, আমি তখন বংশীকে অনেক বার ডেকেছিলাম, নয়? গীতা হাতে নিয়ে আবার ভুল-টুল কিছু বলে ফেল্‌ছি নে ত'? দেখিস মা!

গায়ত্রী রান্না ঘর হইতে বংশীকে আসিতে দেখিয়াছিল, কিন্তু এতক্ষণ কোন কথা বলিবার অবসর হয় নাই। এইবার উনান হইতে শব্দায়মান কড়াইটা মাটিতে নামাইয়া বাহিরের দিকে তাকাইতেই বংশীর সঙ্গে তাহার চোখোচোকি হইয়া গেল। বলিল, এই বুঝি তোমার তাড়াতাড়ি ফেরা হচ্ছে বংশী?

বংশী কোনও উত্তর দিল না। রত্নেশ্বর বলিয়া উঠিলেন, ও হ্যাঁ, তুই ত' বাড়ী ছিলি নে। সেই সকালে বেরিয়ে গিয়ে এই এত বেলায়—নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, কি করিস তুই সারাদিন? রোদে রোদে টোঁ টোঁ করে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরে বেরাচ্ছিস বুঝি? বি-এ পাশ করলি, ঘরে বসে, দুদণ্ড তাই বই-টইগুলো ত্থাখ,—তা নইলে খাবি কি? আমি যত দিন, পেনসেন্‌ও ততদিন। তারপর

আমি মরে গেলে? এই পর্য্যন্ত বলিয়াই গলার স্বর তাঁহার আবার নরম হইয়া আসিল, এবং তাঁহার অভ্যাস মত এই বার তিনি যে সব কথা বলিতে লাগিলেন তাহার একটি বর্ণও বুঝিতে পারা গেল না। মিনিট দুই পরে আবার তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। বলিলেন, না, না, এ-সব চলবে না বাপু, তার চেয়ে এখন থেকে হাকিম-টাকিমের পোষ্ট কোথাও খালি-টালি আছে কি না ত্যাখ,—এণ্ডার্‌সন সায়েবের সুপারিশে হয় ত' লেগেও যেতে পারে! হ্যাঁ, সে-ই ভালো। আমি বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে চল্ না হয় এক দিন আমায় নিয়েই চ'তার কাছে। আমার কথা সে ঠিক শুন্‌বে! তার আমি অনেক করেছি, অনেক কষ্ট সয়েছি আমি তার জন্যে,—সে সব কথা সে ভুলে নি।—কেন ভুলবে? যতই হোক্ রাজার জাত—রাজার জাত তারা, ন্যায় ধর্ম্ম না থাক্‌লে কি তারা থাক্‌তো এত দিন? ধ্বংস হয়ে যেতো,—কোন্ দিন ধ্বংস হয়ে যেতো।

রান্না ঘর হইতে গায়ত্রী বলিল, এত বেলায় এসে আবার অমন হাঁ করে' দাঁড়িয়ে রইলি কেন বংশী? যা না, চান করে নে।

রত্নেশ্বর আর একবার সস্নেহ নয়নে বংশীর মুখের পানে তাকাইলেন। বলিলেন, হ্যাঁ যা, মুখখানা শুকিয়ে গেছে।—দেবে, দেবে, তার জন্যে ভাবিস্ নে, এণ্ডার্‌সন্ দেবে, পেন্‌সেন আমি মরে গেলেও দিতে হবে। অন্তত তোদের এই দুটো ভাই-বোনের মুখ চেয়েও দেবে। অনাথকে দেখে' দয়া হবে না? বলিস্ কি রে ক্ষ্যাপা? এমনি সব আরও অনেক কথাই তিনি মনের আবেগে বলিয়া যাইতে লাগিলেন; তাহার পর হঠাৎ যেন কি ভাবিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু সেই দন্তহীন বৃদ্ধের এই অট্টহাসি শুনিয়া দূর হইতে মনে হইল, ঠিক যেন তিনি কাঁদিতেছেন। বংশী তখন তাহার ঘরের ভিতর ঢুকিয়া জামা কাপড় ছাড়িতেছিল, সহসা এই চীৎকারে সচকিত হইয়া তাহার রুদ্ধ দুয়ারটা একবার ঈষৎ ফাঁক করিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। দেখিল,—না, কিছুই হয় নাই, বাবা তখনও ঠিক্ তেমনি ভাবেই নত মুখে বসিয়া আছেন।

উঠানের পাশ দিয়া ধীরে-ধীরে বংশী তাহাদের কলঘরে গিয়া ঢুকিল। রান্নাঘর ও এই ঘর দুইটা পাশাপাশি,—মাঝখানে মাত্র একটা ভাঙা টিনের ব্যবধান। দোর বন্ধ করিয়া দিয়া চৌবাচ্চার কাছে বংশী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর মাঝের সেই টিনের পর্দ্দাটার কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, গীতা কে এনে দিলে দিদি?

এ ধার হইতেও তেমনি চাপা গলায় উত্তর আসিল, তুই ত' পারলি নে, তাই আমিই এনে' দিলাম।

বাজার ?

গরম কড়াই-এর উপর ছাঁই করিয়া কিসের একটা শব্দ উঠিল। বংশীর প্রশ্ন গায়ত্রী শুনিতে পাইল না।

শীতে আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকাও যায় না! বংশী আর কোনও প্রশ্ন করিল না ; হড়্ হড়্ করিয়া মাথায় জল ঢালিতে লাগিল।

স্নানান্তে সে উঠানের রৌদ্রে আসিয়া দাঁড়াইল ; জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, খেয়েছেন ?

রত্নেশ্বর কোনও জবাব দিলেন না। গায়ত্রী তখন বারান্দার উপর তাঁহার ঠাঁই করিতেছিল। বলিল, না। বল্‌লাম দশটার সময়, কিন্তু উনি খেলেন না কিছুতেই।

রত্নেশ্বর এই বার মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বলিলেন, এঁ্যা, দশটা ? হঁ্যা দশটাই হবে। ডাক্তার বলেছিলেন, দশটার সময় খেতে। তা, হঁ্যা,—দশটা কি বেজে গেছে মা ?

গায়ত্রী ঈষৎ হাসিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল, না, দশটা এখনও বাজে নি—বারোটা বেজে গেছে।

রত্নেশ্বর সে কথা বোধ করি শুনিতে পাইলেন না।

বংশী তাহার ঘরের ভিতর গিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া চুল আঁচ্‌ড়াইতে ছিল। মেঝের উপর আসন ও জলের গ্লাসটা নামাইয়া দিয়া গায়ত্রী হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, বিশ্বাস হলো না তোর ?

বংশী বলিল, কি ?

—বাবার গীতাখানা আমি নিজে গিয়ে কিনে' এনে' দিলাম ?

বংশীর চুল আঁচ্‌ড়ানো তখন শেষ হইয়াছিল, তথাপি জানালাটার কাছে আরও একটুখানি সরিয়া গিয়া চুলের উপর চিরুণীটা অনর্থক খুব জোরে জোরে টানিতে টানিতে উত্তর দিল, হঁ্যা, জানি—জানি,—

গায়ত্রী বলিল, কি জানিস ? কই, বল্ দেখি বাজার আজ কেমন করে হলো ?

হঁ্যা হঁ্যা সব জানি। বলিয়া একটু খানি থামিয়াই বংশী আবার বলিতে লাগিল, কিন্তু এ তোর ভারি অন্যায় দিদি। অমরেশকে দিয়ে কেন এ সব করানো ? কি দরকার ছিল ? আজ না হয় একটুখানি দেরীই হতো . . .

গায়ত্রী বলিল, তোর মেজাজ আজ ভারি গরম দেখ্‌ছি ! কি হয়েছে কি ?

বংশী বলিল, হবে আবার কি ?

গায়ত্রী তেমনি ভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়াই উত্তর দিল, বারণ যদি কেউ আমার না শোনে ত' আমি কি কর্‌ব ? বল্‌লাম, বাজার বংশী এসেই কর্‌বে, তা সে কথা সে শুন্‌লে না। এমন্ কি, পয়সা দেবার জন্যে দরজা পর্য্যন্ত ছুটে গেলাম কিন্তু সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে মোটরে চ'ড়ে বস্‌লো।

বংশী কহিল, তা হ'লে পয়সাও সে নিজেই দিয়েছে ?—না, না, এমন ক'রে আমাদের আর বেঁচে থাকায় কোনও লাভ নেই। তার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আমাদের একদিন ম'রে যাওয়াই ভালো।

কথাটা বলিয়াই নীচু জানালার উপর একটা পা রাখিয়া বংশী মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গায়ত্রী আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি তাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল, বালাই ! ছি ! এ সব আবার কি অলক্ষণে কথা রে তোর ?—তোর ঘরে যদি কেউ আসে, আমি হাত আড়াল দিয়ে তাকে কতক্ষণ আট্‌কে রাখি বল্ ?

হাত আড়াল দিতে হবে না, তুই যা বাবাকে খেতে দিগে যা। বলিয়া বংশী সেখান হইতে সরিয়া গিয়া দেওয়ালের একটা তাকের উপর আর্শী চিরুণীটা তুলিয়া রাখিল।

বংশী মনের ভাব সহসা এরূপ রুক্ষ হইয়া উঠিবার কারণটা গায়ত্রী ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না ; তদবস্থায় কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, বাবা বকেছে বলে' রাগ হয়েছে, বুঝেছি। কিন্তু এই ভরা দুপুরে রাগ-অভিমান ছেড়ে এখন চুপটি করে বোস্, আমি ভাত আনি।

বলিয়াই গায়ত্রী বাহির হইয়া গেল।

অসুখের পর হইতে রত্নেশ্বর দিনে-দিনে অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং অথর্ব্ব হইয়া পড়িতেছিলেন। লাঠি কিংবা লোকের সাহায্য ব্যতীত নড়িয়া বসিবার সামর্থ্য ছিল না।

ভাতের থালা ধরিয়া দিয়া গায়ত্রী কাছে আসিয়া তাহার ডান-হাতখানি ধরিয়া বলিল, ওঠো বাবা, ভাত দিয়েছি।

কাঁপিতে কাঁপিতে কোন প্রকারে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ধরিয়া ধরিয়া গায়ত্রী তাঁহাকে তাঁহার আসনের কাছে লইয়া আসিল। বলিল, এদিকে তোমার ত' দেখি সোর-ঘোর কিছু থাকে না বাবা, কিন্তু বংশী যে বেরিয়ে গেছে এখনও

খায় নি সেটি বেশ মনে আছে। এক দিন না হয় সে দেরিতেই খেতো! কেন তুমি তাকে বকৃতে গেলে এই দুপুর বেলা?

রত্নেশ্বর অর্থহীন দৃষ্টিতে একবার তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, বকৃলাম—হ্যাঁ, তাকে বকৃলাম, নয়? কি যেন সব বললাম! কিন্তু,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঘুরে বেড়াচ্ছে যে দিন রাত টোঁ টোঁ করে'—এই রৌদ্রে। ওর মুখখানা দেখেছিলি আজ? ও কি আর লুকোবার জো আছে রে পাগ্‌লী? গেল যে,—গেল যে শরীরটা ভেঙে এই কাঁচা বয়সে।

যাবে না? রেখেছে যে তোমার সেই এণ্ডারসন্ ওর জন্যে একটা টাকার সিন্দুক, তাই বসে' বসে' খাবে—বলিতে বলিতে গায়ত্রী পুনরায় রান্না ঘরে গিয়া মিনিট কয়েকের মধ্যেই বংশীর ভাতের থালা লইয়া তাহার ঘরে গিয়া ঢুকিল। আপন মনে তখনও সে কি যেন বলিতেছিল; বোধ করি তাহার সমস্ত আক্রোশ গিয়া পড়িয়াছিল সেই এণ্ডারসন্-সাহেবের উপরেই। ভাতের থালাটা নামাইয়া দিয়া দেখিল, বংশী তাহার ভাঙা চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পেন্সিল দিয়া এক টুকরা সাদা কাগজে আপন মনেই হিজি-বিজি কাটিতেছে। গায়ত্রী বলিল, এনে দিতে পারিস তোর সেই এণ্ডারসন্-সাহেবকে আমার কাছে? আঁস্-বঁটি দিয়ে তার নাক-কান কেটে আমি ঝাঁটা মেরে তাকে বিদেয় করি এ দেশ থেকে। মানুষ খুন করবার আর জায়গা পায় নি!—আয়, বোস্ এসে'।

বংশীর হাতের পেন্সিলটা তখন আরও জোরে জোরে চলিতেছিল। সে দিকে মুখ না ফিরাইয়াই বলিল, খাব না।

গায়ত্রী বলিয়া উঠিল, ছাখ্ আর রাগাস্ নে বংশী, এখনও মুখে আমি জল দিই নি। আমার এঁটো হাত, নইলে তোকে আমি চড়্ চড়্ করে টেনে এনে বসাতাম।

হাতের পেন্সিলটা কাগজের উপর ঠুকিতে ঠুকিতে বংশী বলিল, আচ্ছা, বস্‌ছি। কিন্তু তুই বল্—অমরেশ এলে' তার সুমুখে আর কখনও বেরোবি নে, তার সঙ্গে কথা বল্‌বি নে।

অর্থ তাহার যাহাই হউক, কথাটা শুনিবামাত্র সে তরুণী বিধবার সমস্ত মুখখানা হিঙ্গুলের মত লাল হইয়া উঠিল।

—ক্রমশ

বিদ্যা-বণিক

অতীতের সাহিত্য থেকে আমরা দেখ্‌তে পাই যে, তখনকার লেখকেরা রাজা-রাজ্‌ড়া, রাজ-কন্যা, উজীরপুত্র বা এমন কোনও নায়ক-নায়িকাকে অবলম্বন করে' আখ্যায়িকা বা কাহিনী লিখ্‌তেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই হোত। তখনকার সাহিত্য বহুর দখলে ছিল না, দু'চারজন লেখক কাব্যে বা গল্পে তখনকার দিনে তাঁদের সৃষ্টির বিজয়স্তম্ভ গ'ড়ে রেখে যেতেন। সে স্তম্ভ কুতব-মিনারের চাইতে মাপে বড় না হলেও, সাধারণ লোকের পক্ষে যেন দুরারোহ ছিল।

আজকালকার সাহিত্যে একটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে, সেই তখনকার দিনের বিজয়স্তম্ভগুলির বদলে, বহুসংখ্যক লেখকের গদ্য পদ্য গল্প রূপক প্রভৃতি ছাপার যন্ত্রের সাহায্যে দেশের মাটির মধ্যে, গণ-সমাজের বাস্তভিটার আনাচে-কানাচে ঘাসের মত চারিয়ে যাচ্ছে।

এ রকম অবস্থাটা ভাল কি মন্দ সে নিয়ে তর্ক কর্‌লে তার ফলাফল নিয়ে পাঁচ সাতখানা দমে-ভারী বই ছাপিয়ে ফেলা যায়।

তবে এটা নিশ্চয় সুখের কথা, দেশের ছোট-বড় সবাই কিছু-কিছু বিদ্যা অর্জ্জন ক'রে নিজে নিজে অনেক কথা ভাব্‌তে আরম্ভ করেছেন। সেই ভাবনা-গুলিই সাময়িক পত্রের দৌলতে ছাপার অক্ষরে নানা নামে প্রকাশিত হচ্ছে। এতে যাঁরা দোষ ধর্‌বেন, তাঁদের আমরা একথা বল্‌তে পারি যে, পূর্ব্বকালের লেখকেরা যা কিছু গড়ে' গেছেন, তা সাহিত্যের আকারে হলেও, তা দিয়ে দু'চারজনকে বহুলোক হতে বিচ্ছিন্ন কর্‌তে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পুরাকালের সেই সাহিত্য-গুলিকে শুধু এ কারণে মন্দ বলার ধৃষ্টতা আমাদের নেই। কারণ আমরা শিশুকাল থেকে শুনে আস্‌ছি যে, ওসব সাহিত্যের মত "এমনটি আর হয় না"। তাছাড়া, বয়স বাড়্‌বার সঙ্গে সঙ্গে যে দু'চারখানা বই পড়ে' তার খানিকটা বুঝে' খানিকটা না-বুঝে যা' ধারণা হয় তাতেও সেই সব সাহিত্যের কাছে আমাদের সকল বিদ্যা

ও ধারণাকে অহঙ্কারের তাজ খুলিয়ে কুর্ণিশ্ করায়, শ্রদ্ধায় মাথা নত করিয়ে দেয়। এক হিসেবে একেবারে হতবুদ্ধি করে দেয়।

কিন্তু তা সত্বেও একালের লেখার মধ্যে আমরা নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছি ব'লে আমাদের এ সম্বন্ধে কথা বল্‌বার বা নিতান্ত আমাদেরই অস্থি-মজ্জার জিনিষ ব'লে ভাববার বেশী অধিকার আছে।

একটা কথা এইখানে উঠ্‌বে যে, একালের সব লেখাই সাহিত্যে পরিণত হচ্চে কি না? মোট কথায় ধরে নেওয়া যাক্, তা হয়ত হচ্ছে না। কিন্তু তা' হচ্ছে না বলেই আমরা সে লেখাগুলিকে সাহিত্যের বিস্তীর্ণতা থেকে একেবারে বাতিল করে দিতে পারি কি?

লেখক ও আমরা, যারা পত্রিকা চালাই, এই দুই সম্প্রদায় সম্বন্ধে ক'টা কথা বল্‌তে চাই।

প্রথম কথা এই যে, আমাদের আজকালকার নব্য-সাহিত্যিকেরা হয়ত কিছু কিছু তত্ত্বকথা সমুদ্রপার থেকে আমদানি কর্‌ছেন। সেটা না হয়ে' উপায় নেই। কারণ বল্‌তে গেলে অনেক। তার মধ্যে দু'একটা আমরা চোখ ঠারা-ঠারি করে' বুঝে নিতে পারি, কিন্তু এই বিশেষ লক্ষণটি নিয়ে আজকালকার সমগ্র সাহিত্যের আলোচনা হতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা—আজ্‌কাল আমাদের ভাব্‌বার সময় নেই, ভাব্‌বার অবসর যদি মেলে, লিখ্‌বার ফুরসৎ নেই, তার উপর লিখবার সময় থাক্‌লেও লিখ্‌তে শেখার ইচ্ছা নেই, অথচ আমাদের মনের অবস্থাটা চারিদিকের দুরবস্থায় এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের না লিখে উপায় নেই। তার উপর আমরা কাগজওয়ালারা লেখকের এই সকলপ্রকারের অক্ষমতার মধ্যেও তাঁদের কাছ থেকে তাড়া দিয়ে লেখা আদায় করি। আমাদের তাতে কিছু দোষ আছে বলে' মনে হয় না। কারণ আমরা বসেছি বিদ্যা-বণিক হয়ে। যেমনতর লেখাই হোক্ না কেন, ছেপে কোনও রকমে পয়লা তারিখে বা যার যার কাগজ প্রকাশিত হবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাগজ বের করার ভিতর আমাদের অনেকখানি প্রলোভন আছে।

সময়ে কাগজ বার করা আজকাল রেওয়াজ হয়ে গেছে। তবে এর মধ্যে কেউ হয়ত দীর্ঘকাল চুপ করে থেকে একেবারে নাভিশ্বাসের সময় ছুটোছুটি ক'রে এক-পা ছাপাখানায়, এক-পা লেখকের দরজায় রেখে কাগজ ঠিক্ সময়ে বার করেন। তাঁদের নজর হচ্ছে, কাগজখানি সচিত্র হওয়া চাই। কাগজের মূল্য যতই হোক্ না লেখার মূল্যের দিকে তাঁরা একেবারে বেপরোয়া।

তাঁরা হয়ত মনে করেন, রচনা ছাপার হরপে প্রকাশিত হলেই তার মূল্য বাড়ে। এঁদের আমরা বড়দরের বণিক বল্‌তে পারি। নিজের আত্মীয়-পরিত্যক্ত অর্থ বা অপর কোনও ধনীর অর্থের মূলধন দিয়ে এঁরা এ ব্যবসা ফাঁদেন। এ ব্যবসাতে তাঁদের সাহিত্যের কাছে যেন কোনও দায়িত্ব নেই। যেটুকু দায়িত্ব তা' কেবল নিজেদের কোলের দিকে ঝোল্‌ টানার মত। তাঁদেরই হ্যাঁপাতে পড়ে' নব্যসাহিত্যিকেরা জুতো শেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত যে-কোনও বিষয়ে সমান অধিকার অনুভব করে' লিখে যান্। আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রে শ্রম-বিভাগ বলে' কিছু আর নেই। তার কারণ, যে ক্ষেত্রে শ্রমেরই অভাব, সে ক্ষেত্রে তার বিভাগ আর কেমন করে থাকে ?

আর একদল বিদ্যা-বণিক আছেন, তাঁরা নম্বরি মালের দিকে খুব ঝোঁকেন। যথা, সারদাচরণ বড় কলেজের একজন প্রফেসার, তাঁকে দিয়ে একটি গল্প লেখাতে হবেই। অথবা এককালে বিনোদবাবু খুব ভাল লিখিয়ে ছিলেন, এখন নানা কারণে হয়ত আর লেখ্‌বার অবসর পান্ না, তাঁর দুয়ারে ধন্না দিয়ে. তাঁকে রীতিমত তাগিদ দিয়ে একটি লেখা বার ক'রে নিয়ে এলেন! লেখাটি হয়ত বিনোদ-বাবুর, কিন্তু যে-বিনোদবাবু এককালে পাঠকবর্গের চিত্তবিনোদন করেছিলেন, এ লেখা সে বিনোদ বাবুর নয় বলেই মনে হয়। তবু এঁদের চেষ্টা, বিনোদ বাবুর লেখা বের করতে হবেই। কাজেই নূতন লেখকত দূরের কথা, কোনও-কালে-বিখ্যাত বিনোদবাবু পর্য্যন্ত ভেবে চিন্তে অবসর মত কিছু লেখার সুযোগ পান্ না। এই বিদ্যা-বণিকের দল, দেশের লোকের উৎসুক আগ্রহে ঘেন্না ধরিয়ে দেন্।

তাই আমাদের লেখকদের গল্প, স্বল্প হয় না, এমন কি স্বল্পায়তনও হয় না। প্রবন্ধগুলি মণিবন্ধের চালনায় যতই বড় হয়ে উঠুক্ না, তার ভিতরে রস্-কস্ কিছুই থাকে না। কবিতাগুলি ভাব-ছন্দময় শ্লোকের মত মনে হয় না, মনে হয় যেন আদালতের নিলামের ইস্তাহার। এরই মধ্যে যাঁরা নব্যলেখক, তাঁরা একটু ভয়ে ভয়ে থাকেন বলে' তাঁদের লেখার মধ্যে তবু নব সূর্য্যোদয়ের প্রথম আভার মত উদয়মুখ প্রতিভার রশ্মি-রেখা একটু একটু ফুটে' ওঠে।

এঁদের লেখার মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন, সমগ্র সমাজকে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ করা প্রভৃতি কতগুলি মনের খেলার আনন্দ ধ্বনি শোনা যায়। হয়ত বহু-শক্তিশালী অল্পসংখ্যক লেখকের দিন চ'লে গিয়ে' আজ-কাল অল্প-শক্তি-শালী বহুসংখ্যক লেখকের দিন এসেছে, তবুও তাঁরা বাঙলা সাহিত্যের

বাড়বাড়ন্তর দিকে তাঁদের ক্ষমতানুযায়ী কিছু কিছু সাহায্য করছেন। আমরা কাগজওয়ালারা এই নবসাহিত্যকে বেচে খাই, ভাঙিয়ে খাই, তবু যাঁরা আমাদের এই বৈশ্য-বৃত্তিকে সহায়তা করেন, তাঁদের হাত তুলে' কিছু দিই না। কিছু দিই না বল্‌তে এক্ষেত্রে আমরা টাকাকেই বোঝাচ্ছি। অবশ্য একথা অনেকে বল্‌তে পারেন যে, কোনও লেখার দাম কেউ দিতে পারেন না। তাই এই নজিরের সুবিধাটুকু নিয়ে যে সব কাগজওয়ালারা ইচ্ছা থাক্‌লে যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিতে পারেন, তাঁরাও হাত গুটিয়ে বসে' থাকেন।

লিখে পয়সা পাওয়া এদেশে হয়ত নূতন ব্যাপার। আগেকার দিনে লিখে পয়সা পাওয়া যেত না, তার এক কারণ ছিল, কাগজ বের করে তখনকার দিনে এত টাকা কেউ উপার্জ্জন করতে পারত না; কাগজকে বাঁচিয়ে রাখাই দুষ্কর ছিল, তা' লেখককে আবার টাকা দেওয়া—সে'ত আরো দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এখন ত আর তা' নয়। যাঁদের কাগজ বেশ চল্‌তি, যাঁরা কাগজ বেচে বাড়ী হাঁক্‌ছেন, নিজেদের প্রেস করছেন, তাঁরা ত ইচ্ছা করলেই লেখকদের টাকা দিতে পারেন। কেউ কেউ যে একেবারে দেন্ না তা' নয়। কিন্তু তাও অতি সামান্য। আজকালকার দিনে হয়ত দু' একজন নামজাদা লেখক এক আধখানা উপন্যাস বেশ দামে বিক্রী ক'রে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করেন। কিন্তু আর যে সব লোক, সাহিত্যের সেবা করবে ব'লে কায়ক্লেশে প্রাণ ধারণ ক'রে আছে, তাদের কারুরই অতিশয় পরিশ্রম ক'রেও মাসে সব কাগজের বকশিস্ জড় করে পঞ্চাশ টাকার উপরে আর ওঠে না। তাঁরা ভাল লিখ্‌বেন কি করে? খাবেনই বা কি, ভাববেন-ই বা কখন, আর ভাল ভাল বই কিনে অধ্যয়নই বা করবেন কি দিয়ে? তবু আমরা কাগজ-ওয়ালারা বাঁধি গদ আওড়াই, "ভাল লেখা আর কই!" এ ও অবশ্য ঠিক কথা' স্বরস্বতী ও লক্ষ্মীর চিরকালই বিরোধ। কিন্তু এ প্রবাদ বাক্যের ও ত বিপর্য্যয় ঘট্‌তে সুরু করেছে আজ কাল, হয় নি কি?

কাগজের সংখ্যাও যেমন বেড়েছে, লেখকের সংখ্যাও তেমনি বাড়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সে প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গেই লেখকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। লেখার মধ্যে যে আনন্দ, তৃপ্তি তা' বাংলার বুকে বুকে ছোঁয়াচ্ লেগেছে। দেশে যত দুঃখ বাড়ছে, অশান্তি বাড়ছে, ততই মানুষ ভাবতে সুরু করে দিয়েছে। এই ভাবনার ফলই মানুষের রচনা। এই রচনাগুলি মানুষের মন থেকে খেলতে খেলতে বহু মানুষের মনে সখ্যতা স্থাপন করেছে। লেখকে ও পাঠকে যে সম্প্রীতি বাড়ে আমরা তার মধ্যে কোথাও ঠাঁই পাই না। আমরা লেখকের

লেখা বেচি, পাঠকের টাকার হেফাজতি করি, কিন্তু তার শতাংশের কত খানি লেখককে দিই ?

যারা কোন আদর্শ নিয়ে সত্যিকারের প্রাণপণ ক'রে কোনও কাগজকে খাড়া কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছেন তাঁদের হয়ত লেখকদের কিছু দেওয়া আপাতত অসম্ভব, দিতে গেলে ভাঁড়ে মা ভবানী হয়ে দাঁড়াবে। তখন আদর্শ ঘুচে গিয়ে জোচ্চোরি সুরু কর্‌তে হবে। এ-দলকে তাঁদের চেষ্টার সময়টুকুর জন্য রেহাই দিয়ে যাঁরা সমর্থ, সক্ষম এমন সব বিদ্যা-বণিকদের এ বিষয়ে বল্‌বার কি থাকৃতে পারে ? তাঁরা হয়ত বল্‌বেন, আমার খরচ কত তা' জান ?—বেশ ভাল কথা। তোমার খরচ বেশী মানেই তোমার খরচ কর্‌বার মত ক্ষমতা হয়েছে। কিন্তু তা' ব'লে একটা কাগজের আমদানি টাকা দিয়ে যদি তুমি কেবলই অর্থাগমের নানা ফন্দি আরম্ভ কর, তা হলে খরচের হিসাব করা শক্ত। বেশ ত টাকা রোজগার কর, কেউ তাতে তোমাকে পরোপকার-ব্রত সাধন কর্‌তে বল্‌ছে না, কিন্তু যার প্রসাদে আজ তুমি রামের মা' তাদের ভাগেও কিছু কিছু 'আমানৎ' রাখ। তোমরা চিত্রকরের কাছ থেকে ছবি নিয়ে ছাপো বিনি পয়সায়, কারণ সেটা চিত্রকরেরই গরজ। ছবি দু-একখানা কাগজে না ছাপ্‌লে, তার নিজের বিজ্ঞাপন হয় না। কবিতার ত কথাই নাই, কবিতা যে ছাপো এ ত তোমার অনুগ্রহ। প্রবন্ধগুলিও লেখকের বাড়ী গিয়ে চেয়ে আনবার জন্য ট্রামভাড়া পর্য্যন্ত খরচ কর্‌তে হয় না। তার পর পাঁচামিশালী ব্যাপারটি, ওটা ত' আমেরিকা, ইংলণ্ডের ম্যাগাজিনগুলির দৌলতে একখানি চার পয়সার কাঁচি কিনলেই বহু কাল চলে যায়। কিছু ব্লকের খরচ হয়। কিন্তু তা' না দিয়েও উপায় নেই।

কোনও উপায় যদি থাকৃত তা' হলে কি খরচ করতাম ? এত বড় বোকা আমরা নই। বাকী রইল গল্প আর উপন্যাস। ছোট গল্পের দর নেই, কারণ তা' যে-সে লিখ্‌তে আরম্ভ করেছে। তার মধ্যে ভাল মন্দ বাছাই কর্‌বারও একটা ভয় আছে। একবার ভাল বল্‌লেই ফিরে বারে সে লেখক টাকা চেয়ে বস্‌তে পারে, তার চাইতে চুপ্‌চাপ্‌ করে ছেপে যাওয়াই সুবিধা! নেহাৎ যে দু' একজন লেখক একটু নাম করেছে, তাদের কিছু না দিলে নয়, তাই হয়ত নামকাওয়াস্তে কিছু দিতে হয়। লেখকের নেহাৎ দুর্দ্দিন, তাই হাত পেতে নিতে হয়, কিন্তু সে টাকার মোট সংখ্যার কথাটা হয়ত লেখকের অতি বড় আত্মীয়ের কাছেও বল্‌তে লজ্জা করে। তাই বা কটা কাগজে দেয় ? কারা কারা দেয় নাম করে হয়ত তাদের কথা বলা যায়। তবু তাঁরা লেখকদের নমস্য, নেই মামার চাইতে

কানা মামা ভালো। কিন্তু যারা অগাধ টাকা ক'রে, মাইনে করা, দাদন-খাওয়ান সম্পাদক রেখে, লোহার সিন্দুকের পাশটিতে বসে কর্ত্তাগিরি করছেন, তাঁদের কথা আলোচনার অযোগ্য। কিন্তু না করে উপায় নেই। এমন ভাবে তাঁদের এই বৈশ্য-বৃত্তিকে সাহিত্যের আনন্দ-মেলায় অবাধে চল্‌তে দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাঁরা যে কত বড় সার্থপর তা' তাঁদের কাছে যারা গলায় ফাঁসি প'রে সব বিকিয়ে পড়ে আছে তাদের মুখে গোপনে শোনা যায়। লেখকের লেখা ছাপা, এটা তাঁরা মনে করেন লেখককে মহা অনুগ্রহ কর্‌ছেন। টেক্স দেওয়ার ভয়ে কথা তাঁরা কম কন্‌, যা বলেন তা' অতি 'মিষ্টি'। বাংলায় প্রত্যেকটি লেখক যে ঐ ক'টি বিদ্যা-বণিকের চাইতে বিদ্যায়, বুদ্ধি ও চিন্তাতে কত বড় তা' তাঁরা মনেই ভাবতে পারেন না। লেখকের সম্মান তাঁরা কি ক'রে বুঝ্‌বেন? আত্মসম্মান কাকে ব'লে তাই তাঁরা জানেন না, জান্‌লে, পরের সম্মানও রক্ষা কর্‌তে জান্‌তেন। বিনা খরচায় যা' হয় তাই তাঁরা করেন না তার ওপরে লেখককে পারিশ্রমিক দেবেন? বাড়ীতে নাচ গান যাত্রা—"আমি বড় হয়েছি" এ কথা যত রকমে প্রচার কর্‌তে পারা যায় তার জন্য তাঁরা লেখকের লেখা বেচে যে অর্থ সংগ্রহ করেন তা' অকাতরে খরচ করেন। কিন্তু লেখকরা—যে তিমিরে, সেই তিমিরে। তার ওপরে গোদের ওপরে বিষ ফোঁড়া—কতগুলি সম্পাদক অদ্ভুত শক্তি-বলে অনেকগুলি কাগজ বেশ চালিয়ে যাচ্চেন। তাঁদের শক্তির প্রচুরতা, আত্মবিশ্বাসের জোর, সততার তেজ, চেষ্টায় ও চিন্তায় প্রাধান্য এ সবই পুরোণ গোদের ওপর টনটনানি ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ফক্কিকারি যাঁরা এতকাল চালিয়ে এসেছেন, তাঁদের দুর্দ্দিন এসেছে নিশ্চয়। আজকালকার লেখকদের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান যথেষ্ট হয়েছে, বিদ্যা-বণিকের কাছে তাদের আত্মসম্মান ও লেখার সম্মানকে কখনও ক্ষুণ্ন হতে দেবে না।

নবযুগের লেখকেরা নিজেদের লেখা সম্বন্ধে সম্বৃত হয়ে নিজেদের প্রকৃতিস্থ রেখে একটু ধৈর্য্য ধ'রে ক'দিন এ বণিক-দলকে একটু রোয়াব দেখালেই এদের থলির দড়ি খুলে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে লেখকদের অন্তত মানুষ ব'লে সম্মান কর্‌তে এঁরা শিখ্‌বেন।

লোহার সিন্দুকের চাবী ওঁদের থাক্‌, সে টাকা দিয়ে ওঁরা আরও পাঁচখানা কাগজ বার করুন, বইয়ের দোকান করুন, বা থিয়েটার চট্‌কলের সেয়ার কিনুন তাতে লেখকের কিছু যায় আসে না, কিন্তু বাজে খচরের জন্য রোজ যে টাকাটা ব্যয় হয় সেই টাকার থলেটা লেখকদের নামে থাক্‌লেই হোল।

আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম উঠে যাচ্চে তাতে উদারমতের সূচনা দেখা যায়। কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে এমন করে সবাই মিলে বৈশ্যবৃত্তি ধর্‌লে বাংলার সরস্বতীর কাশীপ্রাপ্তি ঘট্‌বে এ কিছু আশ্চর্য্য নয়।



অবস্থান্তর



—শ্রীনৃসিংহদাসী দেবী।

(১)

মহেশগঞ্জ গ্রামের ভিতর ভূধর বাঁড়ুযোর স্বকৃত কোন রকম খ্যাতি-প্রতিপত্তি না থাকিলেও উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি যাহা পাইয়াছিলেন, তাহার মূল্যও বড় কম ছিল না। তাহারই বলে ওই মহকুমার দশ জনের ভিতর দাঁড়াইলে কেহই তাঁহাকে অবহেলা করিতে পারিত না। সাধারণ লোকে ইহা মুক্ত কণ্ঠেই স্বীকার করিত যে, তাঁহার পিতা পিতামহের আমলে কত জন কত রূপে উপকৃত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা কত নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়াছেন, কত বিদ্যার্থীকে উৎসাহ দিয়া ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাদের ভিতর সব চাইতে বড় প্রমাণ শ্রীপতি রায়।

কথাগুলি কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভূধর বাঁড়ুযোর বুকটাও যেন আরো একটু চওড়া হইয়া উঠিত; কিন্তু পরক্ষণেই দমিয়া পড়িতেন নিজের ভাগ্যের ভাবনায়। কি কুক্ষণেই পাটের কারবারে হাত দিয়াছিলেন, যাহার জন্য আজ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন, এক মাত্র পৈত্রিক অট্টালিকাখানি, তাও কিনা আজ সেই শ্রীপতি রায়ের কাছেই বন্ধক রাখিতে হইয়াছে; মাত্র আর ছয় মাস—যদি এই ছয় মাস পরে টাকা সংগ্রহ করিতে না পারেন তাহা হইলে কে জানে তাঁর এই অবশিষ্ট সম্ভ্রমটুকু বজায় রহিবে কি না!

গভীর রাত্রিতে সে দিন বিনিদ্র নেত্রে ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে করিতে অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি করিয়া তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন। শৈশবের কত রকমের ঘটনা, কত প্রিয়জনের হাসিমুখের স্মৃতি বসন্তের ঝরা পাতার মতই অন্তরের ভিতর স্তূপীকৃত হইল,—সব চাইতে বড় বেশী ভাবেই চোখের নিকট ফুটিয়া উঠিল দুটি দিনের দুটি বিপরীত স্মৃতি।

একটি দিন, যে দিন জীবনের প্রথম অঙ্কে রঙিন স্বপ্নভরা অন্তরটাকে লইয়া দাম্পত্য-গ্রন্থির সঙ্গে নবপরিণীতা সঙ্গিনীর সহিত অট্টালিকার অভ্যন্তরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সে দিন এই নীরব শুব্ধ বাড়ীটি কি আনন্দমুখর ভাবেই না তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছিল। আর এক দিন,—সেদিন তাহাকেই চির বিদায়ের বেশে সাজাইয়া দিয়া অজস্র শূন্যতার সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখনো যে ইহারই বুকে আত্মগোপন করিয়াই তিনি ক্রমশ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু মাত্র এই কয় মাস পরে যদি ইহাকেও ত্যাগ করিতে হয়! ভূধর বাঁড়ুয্যের মস্তিষ্কের ভিতর বিপুল দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া গেল, শ্রান্ত ভাবে তিনি বিছানার এক পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, পৃথিবীর সব চাইতে দৃঢ় বন্ধন হইতে ত' তিনি মুক্ত, কিসের এত চিন্তা, এত মনস্তাপ তাঁর!

শয্যার প্রান্ত দেশ হইতে ইতিমধ্যে বালকের সরল কণ্ঠস্বর আসিল, "এখনো ঘুমোন নি বাবা?"

এ যেন তাঁর মুক্তির আনন্দকে বিদ্রূপ করিয়াই ভগবানের বিকট রহস্য! ভূধর বাঁড়ুয্যে শিহরিয়া উঠিলেন,—না, না, এখনো যে গভীর বন্ধন, কঠোর কর্ত্তব্য তাঁর সম্মুখে, এই মাতৃহীনের সমস্ত দায়িত্ব যে একমাত্র তাঁহারই। চিন্তা স্রোতটাকে কোন রকমে সংযত করিয়া তিনি উত্তর দিলেন, "না, এতক্ষণ ঘুম পায় নি মাণিক।" পরে তিনি তাহার পাশেই শুইয়া পড়িলেন। মাণিক তন্দ্রাজড়িত চোখে অনেকখানি তৃপ্তির সঙ্গেই নিজের বাঁ হাত খানি দিয়া তাঁহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা, আমার কিন্তু এক ঘুম হয়ে গেল, আপনার ঘুম পায় না কেন?"

তাহার পর মাণিক একান্ত নির্ভরশীল ভাবেই তাঁহার বুকের ভিতর ঘুমাইয়া পড়িল। ভূধর বাঁড়ুয্যে দ্বিগুণ আগ্রহে তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন কিন্তু কয় বিন্দু অশ্রু অনেকটা অনাহূত ভাবেই আসিয়া তাঁহার চোখের প্রান্ত পূর্ণ করিয়া তুলিল।

(২)

ছয় মাস নির্ব্বিবাদেই চলিয়া গেল। ভূধর বাড়ুয্যের মুখের দিকে চাহিয়া পা ফেলিবার সময়ে সে একটুও ভুল করিল না। প্রভাতের সোনার আলো সমান ভাবেই আসিয়া পৃথিবীর বুকের উপর পড়িল, সমান ভাবেই নবজাগরণের বাণী

আনিয়া দ্বারে দ্বারে প্রচার করিল। এই সময়ে একজন আগন্তুক আসিয়া তাঁহার বৈঠকখানার দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন। ভূধর বাঁড়ুয্যে তখন অতীত কালের দরুণ একখানা আরাম কেদারায় ঠেসান দিয়া নিস্তব্ধ ভাবেই পড়িয়াছিলেন। আগন্তুকের পদশব্দে চকিতভাবে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং শিষ্টাচার সঙ্গতভাবে আর একটা চেয়ার আগাইয়া দিয়া বলিলেন, "ভাল আছ ত হে!"

"ভাল, ভাল আর কই!" পরে অনেকটা অপ্রসন্ন মুখেই আগন্তুক চেয়ারখানি দখল করিয়া লইয়া বলিল, "বেশীক্ষণ বস্‌বার মত সময়ও আমার নেই, তবে এক-বার যদি না আসি মনে করবে, শ্রীপতি এদিকে আর খোঁজটা নেওয়াও উচিত মনে করে না, ওদিকে আবার মক্কেলের দল এসে ব'সে রয়েছে,—হাঁ ভাল কথা এদিকের কতদুর কি কর্‌লে?"

খোঁজ নিতে আসার উদ্দেশ্যটা ভূধর বাঁড়ুয্যের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই, কথার গতিটা কোন পথে তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হইল না, তথাপি বলিলেন, "কোন্ দিকের?"

"এই টাকাটার হে!"

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া তিনি উত্তর দিলেন, "গাছের ফল হলে আর কোন ভাবনা ছিল কি, তবে যদি দিন পনের' সময়টা দিতে তা হলে একবার চেষ্টা করে দেখা যেতো!

উভয় ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া অপেক্ষাকৃত গম্ভীর মুখেই শ্রীপতি রায় বলিল, "এতদিন সময় তো তোমার হাতেই ছিল, এখন আর যে আমার সময় দেবার যোটি নেই—এই দেখ ষোলই বোশেখেই মেয়েটার বিয়ের সব ঠিক করেছি, এখন টাকা ক'টা গুছিয়ে না নিলে তো আর কাজ চলবে না, অন্য লোক হলে কি আর আমি নিজে তোমার খোঁজ নিতে আসি, কেবল তোমার বাপের কাছে উপকৃত ব'লে তাই।"

ইহার কিছুমাত্র উত্তর না দিয়া ভূধর বাঁড়ুয্যে গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিলেন। শ্রীপতি রায় পুনরায় বলিল "দেখ এই যে টাকা জিনিষটে, একে রাখ্‌তে হ'লে হিসেবী হওয়ার দরকার, এত বড় সম্পত্তিটে তুমি কেবল বে-হিসেবীতে উড়িয়ে দিলে, এদিকে আমার দেখ টাকা না হলে চল্‌ছে না, কাজেই দেখ ইচ্ছে না থাকলেও . . ."

বাধা দিয়া এইবার ভূধর বাঁড়ুয্যে বলিলেন, "সে কথা আমাকে বিশেষভাবে

স্মরণ করিয়ে দেওয়ার যে বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে তা আমার মনে হয় না শ্রীপতি !"

অন্ধকারের মত মুখ করিয়াই এবার শ্রীপতি রায় ব'লল, "তবু তোমাকে এক-বার নিজে এসে জানান উচিত মনে হ'ল। জানি লোকে দোষটা আমারই দেবে।" ইহার পর সময়ের দাবী করিয়া শ্রীপতি রায় গৃহ ত্যাগ করিল।

ভূধর বাঁড়ুয্যেও স্তব্ধ মূর্চ্ছাহতের মতই বসিয়া রহিলেন। "এই শ্রীপতি রায় না আই, এ, পড়ার অর্থ-সংগ্রহ করিতে না পারিয়া পড়া ছাড়িবার উপক্রম করিয়া-ছিল, তিনিই না পিতাকে অনুরোধ করিয়া তাহার সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। আজ কিছু দিনের সময় দিতেও সে অপারগ! কত বড় জ্ঞান-পাপী সে, কতখানি দাম্ভিকতার সহিত আজ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিতে গিয়া তাঁহার বুকটা অপমানের বেদনায় চীৎকার করিয়া উঠিল, মনে হইল, পৃথিবীতে স্নেহ দয়া কৃতজ্ঞতা ব'লে কিছু নেই, নিষ্ঠুর নির্ম্মম এই পৃথিবীর বুকটা।

মাণিক আসিয়া এই সময়ে তাঁহার হাত ধরিয়া ডাকিল, "বাবা, বেলা হল, হরির মা ভাত নিয়ে ব'সে আছে উঠুন!"

"যাই," সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিয়া তিনি পূর্ব্বের মতই বসিয়া রহিলেন, তাঁহার ভিতরটায় তখন হাতুড়ীর ঘা পড়িতেছিল। 'এই পাচিকা এই পরিচারিকা আজও তাঁহার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু কয়দিন পরে!' ক্রমশ তাঁহার যেন চিন্তা শক্তি লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল।

মাণিক আবার ডাকিল, "বাবা, উঠুন!"

চকিতের ভিতরে চমক ভঙ্গের মতই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত শিথিলপদ চলিতে চাহিল না, আবার সেইখানেই অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িলেন।

(৩)

"কাদ্‌চো হরির মা, কাঁদ কাঁদ, খুব কাঁদ; কিন্তু কেঁদে কি কিছু কর্‌তে পার্‌বে মনে ভেবেছ?—মোটেই নয়! উন্মাদের মতই আকস্মিক ভাবে কথাগুলি শেষ করিয়া ভূধর বাঁড়ুয্যে থমকাইয়া দাঁড়াইলেন। তখন পূর্ব্বোক্ত সময় হইতে পনর দিন সরিয়া আসিয়া বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে, আরো সেই দিন দ্বিপ্রহরেই বাড়ীখানির নীলাম ডাকা শেষ হইয়া গিয়াছে, মাত্র সাতদিন সময়ের উপর নির্ভর!

গৃহস্থের এই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে অনেক দিনের পাচিকা হরির মা অজস্র অশ্রুর সঙ্গে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে ভূধর বাঁড়ুয্যে বাড়ীর ভিতর আসিয়া তাহা লক্ষ্য করিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মতই কথা কয়টি উচ্চারণ করিলেন।

হরির মা অসম্বৃত কাপড়টাকে টানিয়া মাথায় দিয়া এই কথায় আরো দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া বলিল, "ওগো দাদা বাবু, এমন যে হবে তা তো একদিনও ভাবি নি।"

সহসা এ কথার কোন উত্তর না দিয়া তিনি কিছুক্ষণ আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, পরে আপনাকে একটু সংযত করিয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত স্থিরকণ্ঠে বলিলেন, "কাঁদলে চলবে না হরির মা! ওঠ, এখন আমার খাবার বন্দোবস্ত করো, সাতদিন কেন, আমি আর একদিনও এ বাড়ীতে থাকবো না, শ্রীপতি রায়ের এ দয়া আমি কিছুতেই মাথা পেতে নিতে পারবো না! আমার যা-কিছু জিনিষ-পত্র সুরেশের বাড়ীতে রেখে গেলাম, সেগুলোর খোঁজ-খবর নিও, আর এই খুচরা যা আছে সব তোমাকে দিয়ে গেলাম। তুমি তোমার ঘরে নিয়ে যেও, অনেক দিন ছিলে, আমাদের ছেড়ে যে তুমি, হরি মানুষ হ'লে তার কাছেও যেতে পার নি।"

ভূধর বাঁড়ুয্যের গলাটা ভারী হইয়া উঠিল, অসমাপ্ত কথাতেই তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

হরির মা আকুল স্বরে বলিয়া উঠিল, "ওগো দাদা বাবু, মাণিক আমার, মাণিককে ছেড়ে কেমন করে থাক্‌বো গো, ওকে যে বুকে ক'রে মানুষ করেছি গো।"

ভূধর বাঁড়ুয্যে ইহার যেন আর কোন সঙ্গত উত্তর না পাইয়া উভয় হাতে মুখ ঢাকিয়া ধূলিমলিন বারান্দার উপরেই ভিত্তি-গাত্রে ভর দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

এই রকম বেদনা ও অশ্রুর ভিতর অপরাহ্নটা অতীত হওয়ার পর যখন সন্ধ্যার তরল অন্ধকার চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল, দূরে দূরে গ্রাম্য দেবালয়ের শঙ্খ ও কাঁসরের শব্দ ধীরে ধীরে বাতাসের সঙ্গে আকাশের বুকে মিশিয়া পড়িল, ক্রমশ নীলাকাশের বুকে যখন একটির পর আরো একটি, পরে আরো একটি করিয়া রীতিমত ভাবে গুটিকয়েক নক্ষত্র সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মতই শোভা পাইতে লাগিল, সেই অবসরে নিজের শেষ বক্তব্য হরির মাকে জানাইয়া মাণিকের হাত ধরিয়া ভূধর বাঁড়ুয্যে শেষবিদায় গ্রহণ করিলেন।

তখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইয়া উঠিয়াছে। পথে নামিয়া যে পথে জনমানবের সমাগম বিশেষ কম তিনি সেই পথটাই আজ শ্রেয় বিবেচনা করিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। সম্মুখে নিস্তব্ধ গভীর অন্ধকার, কয়েক পদ চলিবার পর আর্ত্তভীতকণ্ঠে মাণিক বলিল, "কোথায় যাবেন বাবা!"

এতক্ষণ তিনি আচ্ছন্নভাবেই পথ চলিতেছিলেন, বালকের কণ্ঠস্বরে এতক্ষণে ভিতরে যেন একটা সাড়া আসিল, তিনি সুগভীর স্নেহের সঙ্গে তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "আমি আছি, ভয় কি মাণিক।"

তাহার পর মাণিককে বিপুল আগ্রহে বুকের ভিতর চাপিয়া তিনি উদ্‌ভ্রান্ত ভাবেই কোথায় ছুটিয়া চলিলেন, নিজেই ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার গমন-পথে বাধা দিবার জন্য কোন আহ্বান আসিল না।

(৪)

পল্লীর নদীটি শান্ত গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। গোধূলির মন্দবাতাসে ঢেউগুলি লীলায়িত গতিতে কোন্ অচেনার সম্ভাষণে ছুটিয়াছে, বিশ্বের বিরাট সভ্যতার সংস্পর্শহীনভাবে বেলাভূমির কয়েক হাত উপরে উদার আকাশের উদার স্নেহ মাখিয়া কয়েকখানি তৃণাচ্ছাদিত কুটীর হাসিতেছিল। কয়জন কৃষিজীবীকে লইয়াই এই পল্লীর সীমার শেষ হইয়া গিয়াছিল। ইহার তিন দিকে সীমানার শেষ চিহ্নরূপে বর্ত্তমান ছিল, এক উদাস প্রান্তর আর অবশিষ্ট দিকটিতে এই স্বচ্ছতোয়া তটিনী চপলা বালিকার মতই বিচিত্র ভঙ্গীতে বহিয়া যাইত। তখন পূর্ব্বকাল হইতে প্রায় পনর বৎসর সরিয়া আসিয়াছে।

গভীর তন্ময়তার সঙ্গে জনৈক প্রৌঢ় ব্যক্তি সম্মুখের নদীটির বুকের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া ছিলেন, তাঁহার বিশাল চক্ষের নীচে আজ নিবিড় ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল রিক্ত পথিকের চিহ্নটি।

নদীটির উপর দু' একখানি নৌকা যাতয়াত করিতেছিল, প্রৌঢ়ের দৃষ্টি সেই দিকেই পড়িয়াছিল যেন কাহার প্রতিক্ষায়। এই অবসরে একখানি নৌকা আসিয়া ধীরে ধীরে নদীর কিনারে আসিল, তাহার অভ্যন্তর হইতে একটি তরুণ যুবক কুলে উঠিয়া আসিল, এবং পরক্ষণেই সম্মুখে প্রৌঢ়কে লক্ষ্য করিয়া সেখানে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের ধুলি লইয়া ডাকিল, "বাবা!"

আনন্দ ও বেদনার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হইয়া ভূধর বাঁড়ূয্যে এতক্ষণ কেমন হতচেতন হইয়া গিয়া ছিলেন, গাঢ় স্বরে তিনি বলিলেন—"এসেছ মাণিক।"

"এসেছি বাবা, কাজ সেরে তবে ফিরেছি, চলুন আবার আপনাকে মহেশগঞ্জে নিয়ে যাই,—দেখবেন শ্রীপতি রায়ের অবস্থা, মাতাল হয়ে কি ক'রে সে সর্ব্বত্র খুইয়ে ফেলেছে, কি ক'রে আমি আবার সেই বাড়ী দখল নিয়েছি চলুন !"

উত্তেজনার সঙ্গে কথাগুলি শেষ করিয়া মাণিকও সেই খানেই বসিয়া পড়িল।

নিবিড় উদাসীন ভাবে ভূধর বাঁড়ুয্যে বলিলেন, "আমি আর যাব না মাণিক !" অশ্রু রুদ্ধ গাঢ় গলায় মাণিক বলিল—"কেন বাবা ? মামা যে আপনার অপেক্ষায় আছেন।"

"তাঁকে বলো, তোমাকে মানুষ করার জন্যে আমি তাঁর কাছে যথেষ্ট ঋণী, কিন্তু আমার যে এখন এই ভাল লাগে,—এই স্বচ্ছন্দ সুখ, পরিশ্রমশীল মানুষ, যারা আমার বড় দুর্দ্দিনে আশ্রয় দিয়েছে তাদের যে আমি বড় ভালবাসি মাণিক !"

মাণিকের চোখে জল আসিল, বলিল, "তবে আমি কেন চেষ্টা করলাম এত, আমি উপায় করতে শিখে পর্য্যন্ত, বিকেলের জল পর্য্যন্ত না খেয়ে, আজ পাঁচ বছর ধরে যে ঐ করে'ছি। হয় মহেশগঞ্জে নতুন বাড়ী ক'রে আপনাকে নিয়ে গিয়ে বসাব, না হয় সুযোগ মত ঐ বাড়ীই কিন্‌বো এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই আমি দিন কাটিয়েছি, বাবা !"

একান্ত শান্তভাবে ভূধর বাঁড়ুয্যে তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "তা যে তোমাকে করতেই হবে মাণিক, আমার অপহৃত সম্মান সে যে তোমাকেই উদ্ধার করতে হবে,—তাই বলে আমায় নিয়ে আর টানাটানি করো না,—এই মাটির মায়ের কোল, এই মুক্ত আকাশ—এরাই আমার প্রিয় সঙ্গী হয়ে শেষ দিন পর্য্যন্ত আমাকে বুকে ক'রে রাখবে !"

মাণিক ব্যথিত নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার কোলের উপর মাথা রাখিয়া নীরব হইয়া রহিল। দিগন্তরেখার কোলে শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ হাসিয়া উঠিল। অজস্র জ্যোৎস্না আসিয়া তটিনীর সর্ব্বশরীর আলিঙ্গন করিয়া বেলাভূমি চুম্বন করিয়া অদূরস্থ কৃষক-কুটীরের অভ্যন্তর হইতে সন্ধ্যার মন্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিল—বাঁশরীর শান্ত করুণ সুর।



প্রতীক্ষায়



—শ্রীসুবোধ দাশ গুপ্ত।

দু'হাতে দরজাটা ঈষৎ ফাঁক ক'রে লেখা মৃদুস্বরে ডাক্‌ল, 'রাঙ্গা-দাদা'—হাতের মৃদু গতিতে চুড়িগুলো এক সঙ্গে রণিয়ে উঠ্‌ল।

অন্ধকার ঘরে বিছানার উপর উপুড় হয়ে সুনীল নিশ্চল ভাবে প'ড়েছিল, ডাক শুনে তাড়াতাড়ি উ'ঠে ব'সে বল্লে, কে ?—এস।

সন্ধ্যার আগেই বাড়ীর সকলে এক বাড়ী নেমন্তন্ন রাখ্‌তে গেছিল, শুধু লেখা ছিল বৃদ্ধ রুগ্ন ঠাকুর-দাদার পরিচর্য্যায়, আর ছিল তার বাপ-মা হারা জ্যেঠতুতো ভাই সুনীল।

লেখা আস্তে আস্তে ঘরে ঢুক্‌ল। অনেক কথা ভেবে এসেছিল সুনীলকে বল্‌বে ব'লে কিন্তু এই নিবিড় অন্ধকারে এসে সব ভুলে গেল। স্তব্ধ হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

সুনীল বল্লে, দাঁড়িয়ে রইলে যে, বোস।

—আলো যে এখনো জ্বাল নি,—যে অন্ধকার !

ব'লে লেখা অন্ধকারে হাত ড়ে সুইচ্‌টা খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল, পরক্ষণেই শক্‌ লেগে উঃ ক'রে হাতটা সরিয়ে নিল। সুনীল উঠে আলোটা জেলে বল্লে, খুব লেগেছে ?

লেখা বল্লে, না। তোমার ওপর আমার ভারী রাগ হয়, তুমি কেন—মাঝ পথে লেখা থেমে গেল। সুনীলের ব্যথিত চোখ দু'টির দিকে চেয়ে লেখার আর কোন কথা বল্‌তে সাহস হ'ল না।

সুনীলের মুখে একটা বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠ্‌তে উঠ্‌তে মিলিয়ে গেল। খুব নরম হয়ে বল্লে, কি ?

—তোমার নামে বাড়ীর সকলে এত কথা বলে, তুমি কেন সব মুখ বুঁজে সহ্য কর ?

—কৈ আমি ত' কিছু জানি না, কেউ কিছু বল্‌ছিল নাকি ?

লেখার রাগ হ'ল, বল্লে, জান্‌বে আবার কি? সেই সকাল থেকে বেরিয়ে যাও, খাবার সময় এসে খেয়ে দেয়ে আবার বেরিয়ে যাও,· এতে মানুষের মনে কি ধারণা হতে পারে তা-ও তুমি বোঝ না?

সুনীল গম্ভীর হয়ে বল্লে, ধারণাটাই সব সময়ে মানুষটার চাইতে বড় বা সত্য হয় না। আচ্ছা কি ধারণা হয়, তুমিই বল না তোমার কি ধারণা হয়েছে?

—আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম; কিন্তু বাড়ীতে এতগুলো লোক,—কাকা, বাবা, দাদারা—এঁদের কথাগুলো, এত উপেক্ষার নয়।

—তা আমি কি করব?

—কি আর করবে, এই ভবঘুরের মত টোঁ-টোঁ ক'রে ঘুরে বেড়াও আর মাথা মুণ্ড কবিতা গল্প লেখ।—

কথা কয়টা খুব ঝাঁঝাল সুরে ব'লেই লেখা উঠে দরজার দিকে পা বাড়াল। সুনীল সহজ সুরে বল্লে, যেও না লেখা!

লেখা ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে, কেন?

—মনে পড়ে সিড্‌নীতে একটা চিঠি লিখেছিলে চ'লে আস্‌তে?

—সব দোষই যেন আমার। তুমিই তো নিজে বলেছিলে জাহাজের চাকরী বড় জঘন্য।

—আমি বলেছিলাম চাকরী করাটাই জঘন্য।

লেখা খুব নরম হয়ে বল্লে, আচ্ছা তুমিই ভেবে দেখ না, এই রকম ছন্নছড়া হয়ে কাটানোই কি জীবনের চরম সার্থকতা? নিজের জন্য না হোক, পরের জন্যও তো একটু ভাব্‌তে হয়। বাড়ীর সমস্ত লোক তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে আছে, একটু চেষ্টা কর্‌লেই কি তুমি এর প্রতিকার কর্‌তে পার না! খুশীর খেয়ালে চলায় আনন্দ আছে স্বীকার করি, কিন্তু সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে চল্‌লে যে, পদে পদে বেসুরো হয়ে যায়, তুমি কি তা একটুও বোঝ না?

কথাগুলো শুন্‌তে শুন্‌তে সুনীল অধীর হয়ে উঠ্‌ল, বল্লে, দেখ লেখা, পৃথিবীতে আমি অনাবশ্যক। বড় হবার কোন দুঃসাহস আমার ভেতর নেই। আমি চাই নিজেকে নিয়ে থাক্‌তে। এতে আনন্দের চাইতে জ্বালা বেশী। তবু আমি জানি আমার এই সমস্ত দুঃখ, সমস্ত ব্যথা, সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা বুকে ক'রে মরণ আমার প্রতীক্ষায় বসে আছে আমার জীবনের জয়মালা গেঁথে। এই জ্বালা-ভরা আনন্দ নিয়েই আমি বেঁচে আছি, আরো অনেক দিন বাঁচ্‌বো।

লেখা রাগ ক'রে ব'লে গেল, যা খুশী তোমার কর, ভবিষ্যতে নিজেই কষ্ট পাবে।

আলোটা নিবিয়ে দিয়ে সুনীল আবার বিছানায় উপুড় হয়ে প'ড়ে রইল। চোখে ঘুম নেই, অশ্রু নেই, এই অনন্ত অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে,—কবে, কবে যে সে এই অন্ধকারের ভিতর বিপুল সুদূরের পথ খুঁজে পাবে, কে জানে!

সুনীলের চোখ দুটো জ্বালা ক'রে উঠল। . . .

* * * *

পরদিন অতি প্রত্যুষে বাড়ীর সকলে জাগ্‌বার আগেই অভ্যাস মত সুনীল পথে বেড়িয়ে পড়্‌ল। কোন্ দূরে দূরান্তে কোথায় কোন্ বনের ছায়া, পাহাড় জঙ্গল, সমুদ্র তাকে যে কবে ডেকে গেছে, সে তাই আর স্থির হয়ে থাকতে পারে না।—

"সে যে পথের চিরপথিক তার কি সহে ঘরের মায়া
দূর হতে রে দূরান্তরে ডাক্‌চে তারে পথের ছায়া।"

চল্‌তে চল্‌তে দেখ্‌ল আকাশ আলো ক'রে সূর্য্য উঠ্‌ছে। সে আলো গাছের পাতায় পাতায়, বাড়ীর মাথায় মাথায়, মেঘের বুকে বুকে ঝিলমিল ক'রে উঠ্‌ল। সে আলোর স্পর্শে পাখীর বুকে সাড়া জাগ্‌ল, ফুলের কানে তার বার্ত্তা পৌঁছল। সুনীলের মনে হল, এই সুরটি শুধু মানুষের বুকে পৌঁছয় নি। যে দিন পৌঁছবে, সে দিন মানুষের সমস্ত নিষ্ঠুরতা সমস্ত সংকীর্ণতা সমস্ত বিদ্রোহ ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে, সেইদিন মানুষ সত্যি ক'রে ভালবাস্‌তে শিখ্‌বে, পৃথিবী সেই দিন ধন্য হবে। কি এক অজানা পুলকে সুনীলের সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌ল।

সারা রাত সে ঘুমাতে পারে নি, পা দু'টো তাই ক্লান্ত, চল্‌তে আর চায় না। সে চুপ ক'রে নদীর ধারে এক পাথরের ওপর ব'সে পড়্‌ল। চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, নদীর জলে আলোর খেলা। নতুন কিছুই নয়, রোজই এ পথ দিয়ে বেড়াতে সে বেরোয় আর রোজই এসব দেখে, কিন্তু আজ তার মনের একটা দিক একেবারে ফাঁকা ছিল, তাই দৃশ্যটি তার চোখে এক নতুন বিস্ময়ের সৃষ্টি কর্‌ল। . . .

দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার চোখে মুখে রোদ এসে লুটিয়ে পড়্‌ল। সুনীল ব্যস্ত হয়ে উ'ঠে দাঁড়াল। আরো কিছুক্ষণ খামখেয়ালি ভাবে পথে পথে ঘুরে সে সহসা অনুকূল বাবুর বাড়ীর কড়াটা জোরে নেড়ে দিল।

ভেতর থেকে প্রশ্ন হ'ল, কে ?

—অনুকূল বাবু আছেন ?

অনুকূল বাবু নিজেই এসে দরজা খুলে ব'লে উঠ্‌লেন, আরে কি সৌভাগ্য আমার, সকালে উঠেই আপনার দর্শন পেলাম !

সুনীল একবার তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

—বলুন।

—আমি বই ছাপাব না।

অনুকূল বাবু বিস্ময়ে ব'লে উঠ্‌লেন, বলেন কি ! অর্দ্ধেক যে ছাপা হয়ে গেছে।

—পুড়িয়ে ফেলুন। আমি আপনার খরচটা শীগ্‌গিরই দিয়ে দেবো।

এই অদ্ভুত কথাগুলো শুনে অনুকূল বাবুর বিস্ময় আরো বেড়ে গেল, পরক্ষণেই সস্নেহে সুনীলের একটা হাত ধ'রে বল্লেন, সুনীল, তোমার কি হয়েছে বল্‌বে ?

সুনীলের চোখ দুটো জলে ভ'রে এল। অনুকূল বাবু বল্লেন, চল চল, ভিতরে বস্‌বে চল, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

বৈঠকখানার দরজাটা খুলে সুনীলকে ভিতরে নিয়ে একখানা চেয়ারে বসিয়ে অনুকূল বাবু বল্লেন, একটু চা'য়ের জোগার করি, কেমন ?

সুনীল কোন আপত্তি কর্‌ল না।

অনুকূল বাবু বাড়ীর ভিতর গিয়ে চা'য়ের বন্দোবস্ত ক'রে ফিরে এসে দেখেন, সুনীল চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে। দরদে ও সহানুভূতিতে তাঁর সারাটা অন্তর ব'লে উঠ্‌ল, আহা !

একটা দীর্ঘনিশ্বাস সুনীলের বুক ছেড়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। . . .

ভৃত্য এসে টেবিলের উপর চা রেখে চ'লে গেল। চায়ের পেয়ালার শব্দে সহসা সুনীল সজাগ হয়ে উঠ্‌ল। সাম্‌নেই অনুকূল বাবুকে ব'সে থাক্‌তে দেখে একটু লজ্জিত হয়ে সুনীল বল্লে, আশা করি কিছু মনে করবেন না। ঘুরে ঘুরে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

নিঃশব্দে চা'য়ের পেয়ালাটা শেষ ক'রে সুনীল উঠে দাঁড়াল। অনুকূল বাবু বাধা দিয়ে বল্লেন, আবার কোথায় চল্লে ?

—বাড়ী।

—তা হলে তোমার বইটা ?

—আপনাকে দিলুম, যা খুশী করবেন।

. . . নিজের ঘরে ঢুকে সুনীল বিছানায় শুয়ে পড়্ল। তার সমস্ত শরীরটা যেন অবশ হয়ে আস্‌ছিল। লেখা তিন বার দরজার কাছে এসে এসে ফিরে গেল, কোন বারই সাহস ক'রে কোন কথা বল্‌তে পার্‌লে না।

অনেক বেলায় যখন সুনীল উঠ্‌ল তখন সে প্রকৃতিস্থ হয়েছে, মুখের উপর থেকে সমস্ত রকম দুশ্চিন্তার ভার একেবারে দূর হয়ে গেছে। . . .

. . . ঘরের ভিতর সে তার সামান্য জিনিষ-পত্রগুলো গুছিয়ে নিচ্ছিল। ড্রয়ার বাক্স খুলে কাগজ-পত্র যা যেখানে ছিল, সব টেনে বার ক'রে একে একে আগুন ধরিয়ে দিল। লেখা এসে জিজ্ঞেস কর্‌ল, এ সব কি হচ্ছে ?

সুনীল একটা সীল করা মোটা এন্‌ভেলেপ বার ক'রে বল্লে, তোমার সব চিঠি-গুলো, ফেলি ওই আগুনের ভিতর ?

সভয়ে শিউরে উঠে লেখা বল্লে, না।

কিন্তু কোন কথা বল্‌বার আগেই সুনীল সেটা আগুনে ফেলে দিয়েছিল, আগুন আবার দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো।

লেখা তীব্র স্বরে ব'লে উঠ্‌ল, কি কর্‌লে, নিষ্ঠুর !

সুনীল সহজ সুরে বল্লে, আমি শুধু ভালবাস্‌তেই জানি না, আঘাতও দিতে জানি, তাই প্রমাণ হয়ে গেল।

ড্রয়ার থেকে সুনীল আর একটা খাতা টেনে বার কর্‌ল, সেটা তার ডায়েরী। জীবনের কত সুখ-দুঃখের কান্না-হাসির ইতিহাস এর পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে, . . . সুনীলের বোধ হয় খুব কষ্ট হচ্ছিল এটা নষ্ট কর্‌তে, সহসা লেখা আবার প্রশ্ন কর্‌ল, এ সবের মানে ?

অগ্নিকুণ্ড থেকে মুখ না তুলেই সুনীল বল্লে, আমি চলে যাচ্ছি; বাড়ীর সকলকে বোলো, আমি আর আস্‌ব না।

সভয়ে লেখা ব'লে উঠ্‌ল, কোথায় যাবে ?

ডায়েরীর খাতাটা নেড়ে চেড়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সুনীল বল্লে, যেখানে মরণ জয়-মালা হাতে নিয়ে আমার প্রতীক্ষায় ব'সে আছে !

সুনীল খাতাটা আগুনের দিকে ঠেলে দিল। তারপর আর একটা ড্রয়ার খুলে গল্প কবিতা লেখা খাতাগুলো একে একে আগুনে ফেলে দিল। লেখা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই দেখ্‌ল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোন কথাই বার হ'ল না। . . .

সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়ে হঠাৎ লেখা ব'লে উঠ্‌ল, দোব না, তোমাকে কিছুতেই যেতে দোব না।

সুনীলের বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠ্‌ল, বল্লে, আমার ওপর তোমার যেটুকু অধিকার ছিল তা তুমি হারিয়েছ।

লেখা সুনীলের খুব সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে চেয়ে ডাকল, সুনীল!

সুনীল নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

লেখা ব'লে যেতে লাগ্‌ল, তুমি ভেবেছ আমি কিছু বুঝি না; কিন্তু বুঝি, সব বুঝি। আমি যে কত অসহায় তা যদি বুঝ্‌তে তাহলে তখন অত নিষ্ঠুর হতে না। তোমরা পুরুষ-মানুষ তোমাদের সব সাজে, কিন্তু নারীর তা সাজে না, তাই তারা বুক ভ'রে শুধু ব্যথাই সঞ্চয় ক'রে রাখে। তুমি পুরুষ, নারীর ব্যথা তুমি বুঝ্‌বে না, কিন্তু আমরা সব বুঝি। জানো, এটা সমাজের চোখে কত বড় অন্যায়!

সুনীল লেখার ভিতর এই স্বাধীন মূর্ত্তিটির অস্তিত্ব কোন দিনই টের পায় নি, তাই সে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে রইল। পরে আস্তে আস্তে বল্লে, মিথ্যা কথা। জন্ম থেকেই শুনে আস্‌ছি; জগৎ নশ্বর, কেউ কারু নয়, আর তোমার আমার সামাজিক সম্বন্ধ যা, তা একেবারে মিথ্যা হ'তে পারে না? আর ভালবাসাটা সব সময়েই গর্হিত নয় লেখা! তুমি তাকে ঘৃণা কর্‌তে পার, কিন্তু অস্বীকার কর্‌বার কোনও উপায় নেই।

দু'জনেই সহসা স্তব্ধ হয়ে পড়্‌ল, অনেক্ষণ পর্য্যন্ত কেউ কোন কথা বল্‌তে পার্‌ল না।

সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সুনীল প্রথম কথা বল্লে, তোমার সমস্ত শক্তিও আজ আমায় বাধা দিতে পার্‌বে না, আমার পথ ছেড়ে দাও লেখা।

শুষ্ক অশ্রুহীন চোখে লেখা দরজার এক পাশে স'রে বল্লে, যাও কিন্তু আমি জানি তুমি আবার আমার কাছে ফিরে আস্‌বে, আমি সেই দিনেরই প্রতীক্ষায় থাক্‌ব।

* * * *

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে।

লেখার দুচোখের পাতায় ভারী হয়ে নেমে এসেছে একটি অনন্ত কালের বিনিদ্র রজনী। সে নিদ্রাহারা চোখ দু'টি মেলে চেয়ে আছে অনন্ত পথের দিকে, কার যেন মিলিয়ে যাওয়া চরণ-ধ্বনি শুন্‌তে পায় বুকের স্পন্দনের তালে তালে।—এ প্রতীক্ষার যেন শেষ নেই, অন্ত নেই—

"ওগো জানি জানি শুধু চলার সুখে
তুমি পা ফেলেছো আমার ব্যথার বুকে
ঐ চলাই তোমার আমার গভীর দুখে
শেষে প্রেম হ'য়ে সে করলো অবতরণ !"

—·—

···প্রকৃতির মায়া দেখিতে পাইতেছ না, কেননা সেই মায়ার ফাঁদে আপনাকে জড়াইয়াছ। যে সুন্দর রূপ দেখাইয়া আজ তোমাকে সে ভুলাইয়াছে, প্রয়োজনের দিন ফুরাইয়া গেলেই সেই রূপের মুখোস সে খসাইয়া ফেলিবে; যে তৃষ্ণার চষমায় ঐ রূপকে বিশ্বের সমস্তের চেয়ে বড় করিয়া দেখিতেছ সময় গেলেই সেই তৃষ্ণাকে সুদ্ধ একেবারে লোপ করিয়া দিবে। যেখানে মিথ্যার ফাঁদ এমন স্পষ্ট করিয়া পাতা, দরকার কি সেখানে বাহাদুরি করতে যাওয়া ?

—যামিনী

রম্যাঁ রলাঁ

—শ্রীকালিদাস নাগ।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে রলাঁর স্থান সম্বন্ধে বিচার বহু পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে, কৃতজ্ঞ মানুষ তাঁহাকে এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলিয়া তাঁহার পদতলে অর্ঘ্য দান করিয়াছে। তাঁহার চিন্তার ধারাকে মানুষ অতুল সম্পদের মত বক্ষে তুলিয়া লইয়াছে। তাঁহার সৃষ্টির ভিতর দিয়া মানুষ জীবনকে নূতন করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলিবার নাই। তাঁহার জীবনের ইতিহাস এত উদার এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, সে সম্বন্ধেও অল্প কথায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে বলিয়া শেষ করা সম্ভবপর নয়। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, কারণ মানুষ তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে তাহা আপনি খুঁজিয়া পাইবে। যাহার ভিতর দিয়া আমরা তাঁহাকে পাইয়াছি বা চিনিয়াছি, সেই অপূর্ব্ব গ্রন্থ—'জাঁ ক্রিস্‌তোফ্' এবং তাহার জন্ম-রহস্য লইয়া সংক্ষেপে কিছু আমরা বলিব এবং আমাদের বিশ্বাস, ইহার মধ্যেই কতক পরিমাণে রলাঁর ব্যক্তিগত বিশেষত্ব আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে।

১৮৬৬ সালে রম্যাঁ রলাঁ ফরাসী দেশের অন্তর্গত বারগ্যাণ্ডীর একটি পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা একজন অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণা রমণী ছিলেন। পিতা ছিলেন আমোদপ্রিয় ও উদার মতাবলম্বী; তাঁহার পিতামহ ছিলেন ফরাসী-বিপ্লবের সময়কার মানুষ। এবং তখনকার কোন কোন আন্দোলনে তিনি লিপ্ত ছিলেন। এই তিনটি বিভিন্ন প্রকৃতির সমাবেশ রম্যাঁ রলাঁর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ফরাসী-বিপ্লবের 'Liberty, Equality এবং Fraternity'—এই তিনটি মূলমন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ তাঁহার রচনায় বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। তিনি ফরাসী হইয়াও তাঁহার উপন্যাসের প্রধান নায়ক জাঁ ক্রিস্‌তোফকে জার্ম্মান্ করিয়াছেন। তিনি যাঁহাদের বিশেষ ভক্তি

শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন তাঁহাদের অনেকেই বিদেশী। যেমন—বেটোভন্, মাইকেল এঞ্জেলো, টল্‌স্টয় ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত ভাবে টল্‌স্টয়ের সহিত তিনি যখন পরিচিত হন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর হইবে। শিল্প সম্বন্ধে আংশিক মতভেদই উভয়ের মধ্যে পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটায় এবং ক্রমে তাহা নিবিড় স্নেহে ও শ্রদ্ধায় পরিণত করে। টলস্টয় What is Art নাম দিয়া যে পুস্তক প্রণয়ন করেন তাহার মধ্যে জগতের সমস্ত শিল্পের প্রতি তাঁহার বীতরাগ প্রকাশ পায়। শিল্প মানুষকে সৌখিন করে, অনর্থক প্রয়োজনের সৃষ্টি করে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি শিল্পকে 'অপ্রয়োজনীয়' প্রমাণ করিতে চান। তরুণ শিল্পী রলঁা তাহাতে ব্যথা পান এবং তাঁহার প্রশ্ন ও সংশয় একটি চিঠিতে টলস্টয়ের নিকট প্রেরণ করেন। তখন তিনি সামান্য একজন বিদ্যালয়ের ছাত্র (১৮৮৬—১৮৮৯)।

টল্‌স্টয়-এর 'War and Peace' হইতে উপন্যাস সম্বন্ধে অনেকখানি জ্ঞান প্রথম তাঁহার মনে জন্মে। ইহা হইতেই বড় একটি আদর্শও তাঁহার মনে স্থান পায়। তিনি অনুভব করেন যে, নভেলই আধুনিক জীবনের মহাকাব্য।

১৮৮৯ হইতে ১৮৯১ পর্য্যন্ত রলঁা রোমে ছিলেন। এবং এইখানে অবস্থান-কালে তিনি Malwida Von Meysenburg-এরসহিত পরিচিত হন। এই বিদুষী মহিলা জাতিতে জারমান এবং স্বদেশ হইতে বিতাড়িত। তিনি সেই সময়কার সমস্ত সমাজ-সংস্কারক, উদার এবং চিন্তাশীল মানুষের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। ম্যাট্‌সিনি, ইব্‌সেন, নিট্‌শে, ভাগ্‌নার প্রভৃতি তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এই মহিলার অনেকখানি প্রভাব রলঁার মধ্যে আসিয়া পড়ে। রলঁার প্রতিভাকে বিকশিত করিয়া তুলিতে Malwida Von Meysenburg যথেষ্ট সাহায্য করেন। তিনি ছিলেন যেন রলঁার আধ্যাত্মিক জননী।

এই সময় হইতেই রলঁা History of the European Opera লিখিতে থাকেন। ১৮৯৫ সালে এই বইখানি প্রকাশিত হয়। এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডক্টর উপাধি লাভ করেন।

১৮৯০, ১০ই আগাষ্ট তারিখে তিনি Malwida-কে একটি চিঠিতে লেখেন :—

"তোমাকে কি বলেছি যে, নূতন রকমের একটা রচনার কাঠামো আমার মনে এসেছে ? সে হবে একটা উপন্যাস বা কাব্য যার ভিত্তি হচ্ছে সঙ্গীত।

"সাধারণত উপন্যাসের উপাদান হয় ঘটনা। হয় সেই ঘটনা নানা মানুষের কাজের জোড়াতাড়া বা তালিকা যেমন ফরাসী-সাহিত্যে বরাবর চলে আস্‌ছে অথবা এক বা একাধিক জীবনের ঘটনাবলীর সংঘাত, যেমন টল্‌স্টয়ের উপন্যাসে দেখি। কিন্তু আমি Musical Romance বল্‌তে সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ বুঝি। তার মধ্যে শুধু ঘটনা সমাবেশ অথবা মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ থাকলেই চল্‌বে না। তার প্রাণ হচ্ছে একটি বিরাট ভাব, একটি নিবিড় অনুভূতি এবং সেই হবে তার মূল সুর, যা থেকে নানা রাগিনীর ঢেউ উঠ্‌বে, মিলিয়ে যাবে, কখনও আবার সংঘাতের মধ্য দিয়েই এক সুর-সঙ্গতির (harmony) সৃষ্টি কর্‌বে। এই বিরাট অনুভূতি একই কালে হবে সেই লেখার উপাদান এবং প্রাণ। আপাতবিরোধ থাক্‌লেও এ দুটি জিনিষ একই মহান অভিব্যক্তি ও শিল্পের সুসঙ্গত প্রকাশ।"

এই সুরেরই প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাই ১৯১৬ সালের তাঁর একটি ডায়েরীর পাতায়—

"রাগিনীর মধ্যে প্রত্যেক স্বরের (note) যেমন স্থান আছে, অথচ শুধু তার মধ্যেই তার আবধ্য থাকা চলে না, স্বর থেকে সুরে আস্‌তে হয়, তেমনি জীবনের ইতিহাসে প্রত্যেক ঘটনার সার্থকতা থাক্‌লেও পরিপূর্ণতার দিকে যে গতি তাই দিয়েই তার বিচার কর্‌তে হয়। এই গতির ছন্দ, নৃত্য ও রূপকে ফুটিয়ে তোলাই শিল্পীর যথার্থ কাজ।"

চব্বিশ বৎসর বয়সে যাহাকে সত্য বলিয়া তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও তাহার প্রতি রলাঁর শ্রদ্ধা অবিচলিত দেখিতে পাই।

জঁা ক্রিস্‌তোফ-এর প্রথম খণ্ড L'Aube (উষসী) তিনি ১৮৯৬, ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে শেষ করেন। তাহার পর কিছুকাল তাঁহার জীবন অত্যন্ত অশান্তির ভিতর দিয়া কাটে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পড়িয়া বেশীদূর অগ্রসর হইতে না পারিলেও তাঁহার মনের মধ্যে জঁা ক্রিস্‌তোফ পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। ১৯০৩, ২০শে মার্চ্চ তারিখে তাঁহার ডায়েরীতে তিনি লিখিতেছেন, "আমি আজ থেকে নিয়ম ক'রে জঁা ক্রিস্‌তোফ্ লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম।" এবং ইহার পর তাঁহার লেখার আর বিরাম ঘটে নাই।

১৯১২, ৬ই ডিসেম্বর, সমগ্র উপন্যাসখানি শেষ করিয়া তাঁহার ডায়েরীতে লিখিতেছেন—

"যাত্রা শেষ" (জঁা ক্রিস্‌তোফ-এর শেষ পর্ব্ব) ! ইহার প্রথম অংশের মূল সুর প্রেম। দ্বিতীয় অংশের বিশ্বাস, তৃতীয় অংশের শান্তি অথবা আনন্দ।



Romain Rolland

...AN PRESS, CALCUTTA

এই তিনটির সম্মিলনে হয়েছে একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি—আমি যাকে বলি Harmony."

বই লেখা হইল; এবার ছাপার কথা। অনেক বড় বড় পুস্তক-বিক্রেতা বা প্রকাশককে তিনি হয় ত' ইহা দিতে পারিতেন, বিক্রয় এবং অর্থসমাগমও যে হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার নানান অভাব যে যথেষ্ট ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। দুঃখ দারিদ্র্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জঁ্যা ক্রিস্‌তোফ-এর ছত্রে ছত্রে তাহা অনুভব করিবেন কিন্তু ভিতরের সংগ্রামই তাহার কার্য্যের একমাত্র প্রতিবন্ধক ছিল না; বাহিরে, অতি জীর্ণ শরীর ও ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া মরণের সহিত নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিয়া তিনি চলিয়া আসিয়াছেন। তাহার উপর আর্থিক অনটন! শুধু সঙ্গীত সম্বন্ধে লিখিয়া সে যুগে বাঁচিয়া থাকা কঠিন ছিল। এমন অবস্থায় পড়িয়াও তিনি আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই। লেখা, যেন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। লেখা শেষ হইলেও সুবিধার পায়ে সে আদর্শকে তিনি বলি দেন নাই। তাঁহার বন্ধু Charles Peguy তখন একটি দ্বৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, তাহার নাম Cahiers de le Quinzaine; এই পত্রিকায় ১৯০৪, ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯১২, অক্টোবরের মধ্যে দশখণ্ডে জঁ্যা ক্রিস্‌তোফ্ প্রকাশিত হইল।

কিন্তু ফরাসী দেশে তাঁহার এতবড় সৃষ্টির মর্য্যাদা প্রথমে কেহ বুঝিল না! তিনি সম্মান পাইলেন সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ড এবং জারমানীতে।

জঁ্যা ক্রিস্‌তোফ্ একটি গ্রন্থমাত্র, ইহা শিল্প-জীবনের একটি অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। বিংশ শতাব্দীর এই অশান্ত বৈচিত্র্যহীন জীবনকে লইয়া এত বড় একখানি গদ্য মহাকাব্য যে লেখা হইতে পারে তাহা পূর্ব্বে কেহ ভাবে নাই।

১৯২১ হইতে ১৯২৩ পর্য্যন্ত এই মনীষীর সহিত বিশেষ কতকগুলির কার্য্যের মধ্য দিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার পরমসৌভাগ্য ঘটে। এবং আমার গভীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার অমরকীর্ত্তি, জঁ্যা ক্রিস্‌তোফ্-কে আমার মাতৃ-ভাষায় রূপান্তরিত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এ কাজটি কত কঠিন তাহা বেশ জানি, তবুও আমার জাতীয় সাহিত্য ইহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে ভাবিয়া অনেকদিন হইতে বেদনা পাইয়াছি। তাই আমার এ দুঃসাহস। একদিন তাঁহার বাসগৃহ Villa Olga-তে তাঁহার সহিত বসিয়া আছি, তিনি তাঁহার পুরাতন রচনা, পৃথিবীর বহু বিখ্যাত মানুষের পত্রাবলী ইত্যাদি আমাকে দেখাইতেছেন; সহসা জিজ্ঞাসা করিলাম, "জঁ্যা ক্রিস্‌তোফ-এর অঙ্কুর কি ক'রে আপনার মনে বিকশিত হয়?"

তাঁহার গভীর দৃষ্টি আমার মুখের উপর রাখিয়া সিগ্ধ হাস্তে বলা বলিলেন, "যেমন ক'রে সমস্ত জিনিষ জন্ম নেয়। এ আমার সমস্ত প্রাণের সঙ্গেই বেড়ে উঠেছে।"

তাহার পর ধীরে ধীরে এ সম্বন্ধে সমস্ত কথা তিনি বলিয়া গেলেন।

জোনভা হ্রদের উপর প্রশান্ত সূর্য্যাস্ত দেখিতে দেখিতে যে কথাগুলি শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাহার একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিলাম।

গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিণীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিণীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়। একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর একজন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে, তবে ত' দুই পক্ষের মিল হয়। তিনি যে গাহিয়াছেন আর আমরা যে শুনিতেছি। তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি।

— শ্রীবিলাস।

পথের আলো

—শ্রীবিজয় সেন-গুপ্ত।

পথের ধারে একটি আলো ; সাঝের বেলা মই কাঁধে-করা একজন লোক এসে তার অন্তরের সুপ্ত শিখাটিকে বাইরে প্রকাশ ক'রে দিয়ে গেছে তাকে পথের অন্ধকার দূর করতে হবে ব'লে। বহুদূরে এরি মতো আর একটি আলো জ্বলচে, কিন্তু দুয়ের মধ্যে দূরত্ব এত বেশী যে, একে অন্যকে চেন্‌বার সুযোগ কোনদিনই হ'ল না।

রাস্তা থেকে একটু দূরেই একটি বটগাছ তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে অনেকখানি স্থানের ওপর আপন অধিকার প্রচার করুচে। তলে তার বিষম অন্ধকার, পথের আলোর ক্ষুদ্র শিখার এমন ক্ষমতা নেই যে, সে আঁধার সে দূর করে। তাই সে ব্যর্থ প্রয়াস ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে তার সমস্ত আলোকটুকু যেন সরিয়ে নিয়েচে।

পথ প্রায় নীরব, কদাচিৎ কোনো গৃহাভিমুখী পথিক মসীমাখা সেই পথ ধ'রে সভয়ে এ-দিক ও-দিক দৃষ্টিক্ষেপ করতে করতে চ'লে যায়···

রাতের পর রাত এমনি যায়, পথের আলোর অপলক আঁখি চেয়েই থাকে না-জানি কোন্ দূরের পানে, আকাশের কোটি তারার সঙ্গে তার যে কি মৌনভাষণ চলে কে তা বল্‌বে ?

রাস্তার এ-ধারে সমুখে খানিকটা খালি জমির পর একখানি বাংলো-ধরণের বাড়ী। কেউ সেখানে নেই এখন, বিষম একটা শূন্যতা যেন কোন্ হতভাগ্যের হতাশ্বাসের মতো সেই বাড়ীখানাকে দখল ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছে। কোথাও একটি আলো জ্বলে না ; কেবল পথের আলোর ম্লান আলোক অস্পষ্ট দেখা যায় বাড়ীর সমুখের একটা জীর্ণ উদ্যান। সবই প্রায় আ-গাছায় ভ'রে উঠেচে তার, কেবল দু-একটা পাম-গাছ কোন রকমে আপন অস্তিত্ব বজায় রেখে কোন্ অতীত সৌভাগ্যের সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে।

পথের আলো একবার মিট্‌মিট্ ক'রে উঠ্‌ল, যেন কোন্ পুরাণো কথা তার মনে পড়্‌চে।

অনেকদিন আগে এই বাড়ীতে থাক্‌ত একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। তাদের দুজনের মধ্যে ভারী সম্প্রীতি ছিল, কেননা, দু'জনে প্রায় সমবয়সী। ছেলেটি এ-বাড়ীর কেউ ছিল না; এ-বাড়ীর গৃহিণীর কোন্ এক আত্মীয়ার ছেলে সে, মা মারা যাবার পর বাপ কোন খোঁজই রাখ্‌তেন না তার, তাই এ-বাড়ীর গৃহিণী তাকে আপনার কাছে এনে ছিলেন।

বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান ছিল এই মেয়েটি, কাজেই তার প্রতি স্নেহ-যত্নের অপর্য্যাপ্ত ধারা তাকে যে নিয়তই অভিষিক্ত করে' রাখ্‌ত, এটা খুবই সহজ কথা; আর তার সাথী বাপ-মা হারা ছেলেটিরও যে এ-বিষয়ে কোন অভাব ছিল, তা তার ব্যবহারে পরিচয় পাওয়া যায় নি কোন দিন।

এ বাড়ীর কাছে এখনো যেমন কোনো বাড়ী নেই, তখনো তেমনি ছিল না। বাড়ীর সাম্‌নে খানিকটা পথ সোজা বেরিয়ে এসে বড় রাস্তায় আপনার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেচে। ঠিক তার' ও-পারেই পথের' আলো দাঁড়িয়ে। বাড়ীর দুই পাশে গোটাকতক শীর্ণ আমগাছ যেন আপনার ফলহীনতায় চিরদিন ম্রিয়মান হয়ে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে আছে। আর পিছনের দিকে আছে লম্বা লম্বা ঘাসের ঝাড়; এত ঘন যে, এ-পার থেকে ও-পারের কিছু দেখা যায় না। ঠিক তার পরেই একটা ডোবা, যেখানে বর্ষাকাল ছাড়া আর কোনো সময়েই এমন জল থাকে না, যা তার পক্ষে কিছুমাত্র গৌরবের কারণ হতে পারে।

এ সবই ঠিক আগের মতোই আছে। নাই কেবল বাড়ী-খানির সেই শ্রী, আর সেই শ্রীবিধান যারা করত, তারাই।

মেয়েটির নাম ছিল শোভনা, আর ছেলেটির নাম সুকুৎ।

অন্য-অন্য বাড়ী থেকে এতখানি দূরে থাকার দরুণ তাদের আর অন্য সঙ্গী জোটে নি। সে-জন্যে যে তারা ক্ষুণ্ণ ছিল এমন মোটেই মনে হত না। তাদের দু'জনেরই মধ্যে তারা একটি রম্য জগতের সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিল। শোভনার বাবা-মা'ও মাঝে-মাঝে তাদের খেলায় যোগ দিতেন, তাঁদের হারাতে পার্‌লে এদের আর আনন্দের সীমা থাকৃত না।

পথের আলো যেন একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল, সেই হাসি-ভরা দিনগুলি যেন মনে পড়্‌চে . . .

এখানকার এই নীরব স্থান তাদের দু'জনের কলহাস্যে সারাক্ষণ মুখরিত হ'য়ে

থাকৃত। সকাল থেকে সুরু ক'রে তাদের নব বিকশিত প্রাণের অফুরন্ত আনন্দের উৎস সারাদিন বেয়েই চলত। নিঝুম দুপুর বেলাতেও তারা ছুটিতে এসে ঐ বটতলায় ব'সে কত কি গল্প কর্ত। এমন কি, কখনো কখনো তাদের তিরস্কারও সইতে হয়েছে এ জন্যে।

সন্ধ্যার পর যতক্ষণ না তারা ঘুমিয়ে পড়্ত, ততক্ষণ তাদের চঞ্চলতার নিবৃত্তি ছিল না। তারা যেন ভরপুর প্রাণের নেশায় অধীর হয়ে ছুটে চলেছিল। . . .

দিনের বেলা অবশ্য পথের আলো উপস্থিত থাক্‌তে পার্‌ত না, এ সকল তার শোনা কথা।

একদিনের কথা তার বেশ মনে আছে, তখন সবেমাত্র সে মই-কাঁধে-করা লোকটির জ্বলন্ত কাঠির স্পর্শে জেগে উঠেচে, এমন সময় একটা কোলাহল তার কানে এল ঐ বাড়ী থেকে। শোভা আর সুকৃৎ কোথায় গেছে এখনো বাড়ী ফেরে নি; তাই বাড়ীময় এই ব্যস্ততা।

খানিক বাদে মেয়েটি তার অনন্ত অধীরতা নিয়ে মা'র গায়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বললে, কেমন লুকিয়েছিলুম!

মা তাদের দু'জনকেই তিরস্কার করলেন; শোভনার বাবা বললেন, বক্‌চ কেন? খেলা কর্‌তে কর্‌তে না হয় একটু দেরীই হয়েচে; ফিরে তো এসেচে—ব'লে তিনি সুকৃৎকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, আর এত দেরী কোরো না বাবা, তোমার মাসি-মা বড় রাগ করেন।

সুকৃৎ বেচারী বোধ হয় একটু অপ্রস্তুতে পড়েছিল, সে নীরবে সম্মতি জানালে।

শোভনার মা বললেন, তুমিই এদের মাথা খেলে . . .

ঝড় থেমে গেল, পরদিন সকালে আবার যা তাই! তাদের উচ্ছল আনন্দের স্রোতকে কে রোধ করে?

কিছুকাল কেটে গেল। ছেলেটি ইস্কুলে যেতে সুরু কর্‌লে। সন্ধ্যাবেলা সে আর শোভনা দুজনেই এক সঙ্গে পড়্ত, শুন্‌তে পাওয়া যেত। তাদের কলরবও আগের চেয়ে অনেকটা সংযত হয়ে এসেছিল।

সঙ্গী তাদের নতুন কিন্তু জোটে নি আর কেউ। ছেলেটির সহপাঠীরা মাঝে মাঝে আস্‌ত, কিন্তু তাদের সঙ্গে সুকৃৎ কোন দিনই ভালো ক'রে মিশতে পারে না; তা ছাড়া তার বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যে সব সহাধ্যায়ী তার জুটেছিল, তাদের সঙ্গে শোভনা বিশেষ মিশ্‌ত না, তাই তাদের সাহচর্য্যে সুকৃৎ তেমন আনন্দ পেত না।

শোভনা মাঝে-মাঝে তাকে জ্বালাতন করার উদ্দেশ্যে বল্‌ত, সুকৃৎ-দা বড় লাজুক, কারো সঙ্গে মিশ্‌তে পারে না।

কিন্তু মনে মনে সে খুশীই হত; কেন না সুকৃতের ইস্কুল যাওয়ার পর না-ফেরা পর্যান্ত তার সময় যেন আর কাট্‌তে চাইত না।

নিজে সে পড়্‌ত বাবার কাছে আর সেলাই প্রভৃতি শিখ্‌ত মা'র কাছে। কেননা তাঁদের ধারণা ছিল, মেয়েদের ইস্কুলে পড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই, কেবল তাতে মেয়েরা বড় বড় কথা কইতে আর বাবুয়ানা কর্‌তে, শেখে।

সন্ধ্যার পর বারান্দায় বসে যখন সকলে মিলে কথাবার্ত্তা হত, তাই থেকেই পথের আলো সারাদিনের খবর পেত, কতক তা বুঝ্‌ত অনুমানে . . .

(২)

তারপর একদিন সুকৃৎ চলে গেল কলেজের পড়া পড়্‌তে। যাবার আগের দিন তারা দুজনে সাঁঝের ঘনায়মান অন্ধকারে বেড়িয়ে ফের্‌বার সময় ঐ বটগাছের কাছাকাছি এসে শোভনা বল্‌লে, সুকৃৎ-দা, আমাদের ছেড়ে তোমার ভাল লাগ্‌বে, সেখানে থাক্‌তে?

বল্‌তে বল্‌তেই তার চোখ দিয়ে জল ঝ'রে পড়্‌ল। সুকৃৎ তাতে কি রকম বিব্রত হয়ে পড়েছিল, কেমন ক'রে শোভনার মাথায় হাত রেখে বলেছিল কত-কি সান্ত্বনার কথা, সব আলোর একে একে মনে পড়ে গেল . . .

তবে চলে যাওয়ার পরদিন শোভনা যখন তাদের দুজনে মিলে-পোঁতা চাঁপা গাছ থেকে গোটা দুই ফুল হাতে ক'রে কি মনে ক'রে সটান পথের আলোর কাছে এসে থম্‌কে দাঁড়াল, সেদিনের কথা আলো কখনো ভুল্‌বে না। এক-একটি চাঁপার পাঁপড়ি ছিঁড়ে ফেল্‌তে লাগ্‌ল; যেন নিঃসঙ্গতার ভার তাকে অত্যন্ত পীড়িত ক'রে তুলেচে . . .

মা তাকে ডাক দিলেন, শোভনা, আর কতক্ষণ বাইরে থাক্‌বি, অন্ধকার হয়ে গেছে যে!

চোখ মুছে শোভনা বাড়ীর দিকে চলে গেল।

শোভনার অবসরকাল রমণীয় ক'রে তোল্‌বার সব চেয়ে মধুর উপায় তখন থেকে হল সুকৃৎ-দা'র চিঠিগুলি। শোভনার বাবা-মাও সুকৃৎকে আপনার ছেলের মতোই মানুষ করেছিলেন, কাজেই একদিন তার সংবাদ না পেলে তাঁরাও অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌তেন বটে, কিন্তু শোভনার মতো অত কেউ নয়।

দিনগুলো তার পক্ষে সহসা অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে উঠ্‌ল ; কেমন ক'রে যে সে সময় কাটাবে ভেবে পেত না। মা তার মনের ভাব বোধকরি কতকটা আন্দাজ ক'রে বেশী ক'রে তাকে ঘরের কাজের মধ্যে টেনে নিলেন। তাঁরো সুবিধা হল এতে, কেননা, এই মেয়েটি ছাড়া আর তাঁকে সাহায্য করবার কেউ ছিল না।

এক-একদিন শোভনার বাবা-মা'র মধ্যে কথা হত, তার বিয়ে সম্বন্ধে। একটি-মাত্র সন্তান সে, কাজেই তাকে এমন ক'রে পর ক'রে দিতে কারোই যে বিশেষ উৎসাহ ছিল তা নয়, তবু কথাটা কখনো কখনো উঠে পড়্‌ত ; কেননা শোভনার বয়স তখন সতেরোর কাছাকাছি।

সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে কখনো মেশে নি ব'লে বিবাহিত-জীবন সম্বন্ধে শোভনার ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল ; মা'কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে লজ্জা আসে, অথচ এ-কথাটা মন থেকে সে দূর করতেও পারে না। একমাত্র যাকে জিজ্ঞাসা করা চল্‌তে পার্‌ত, সে কাছে নেই ; কিন্তু শোভনার মনে হয়, হয় তো সুকৃৎ-দা'কেও সে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার্‌বে না। কেন, তা সে জানে না। . . .

মা তাকে বিয়ে সম্বন্ধে মাঝে-মাঝে ইঙ্গিত কর্‌তেন, তাতে কিছুই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ত না; কেবল তাতে অনিশ্চয়তা বেড়ে উঠ্‌ত। তবু তারি মাঝে যেন একটা অনির্দ্দেশ্য মধুরতা জেগে থাক্‌ত, যার যথার্থ স্বরূপ বুঝ্‌তে চেষ্টা কর্‌লেই সে হাতছাড়া হয়ে পালিয়ে যেত।

ছুটিতে সুকৃৎ যখন বাড়ী এল, সে শোভনার বিয়ের কথা শুন্‌লে ; কিন্তু মনে হাজারবার তোলাপাড়া ক'রেও শোভনা নিজে এ-সম্বন্ধে একটি কথাও সুকৃৎ-দা'কে বল্‌তে পার্‌লে না।

একদিন সন্ধ্যার বৈঠকে যখন এই বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল, তখন সুকৃৎ বললে, তা বেশ তো . . .

তার কথায় মোটেই উৎসাহ ছিল না।

সুকৃৎ-দা'র মুখে এই কথা শুনে শোভনার লজ্জা যেন হঠাৎ বেড়ে গেল, সে মাথা নত ক'রে ব'সে রইল।

তার সেই লাজনত মুখখানি সুকৃতের যেন নতুন ক'রে বড় ভালো লাগ্‌ল ; শোভনা যে এত সুন্দর তা সে এই এতকালেও বুঝ্‌তে পারে নি। আজ হঠাৎ যেন সদ্য-জ্বালা টেবিল-ল্যাম্পের আলোকে কোন্ একটা যবনিকা সরে গিয়ে তার চোখে শোভনাকে অতি মনোরম সুষমামণ্ডিত ক'রে তুল্‌লে।

সেদিন রাতে ভোর হতে তখনো ঘণ্টা দুই বাকী, এমন সময়ে সুকৃৎ ঘর থেকে

সমুখের রাস্তায় পায়চারি সুরু কর্‌লে ; নিশ্চয়ই রাতে তার ঘুম হয় নি। খানিকক্ষণ ঘরে বেড়ানোর পর যেন ক্লান্ত হ'য়ে পথের আলোর অনতিদূরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল আকাশের পানে চেয়ে।

তখন ভোরের দিকে পথের আলোর আয়ু শেষ হয়ে এসেছিল, তাই সে একটু-খানি মিট্‌মিট্‌ করে দেখ্‌লে, সবটা তার দেখা হয়ে উঠল না ; কিন্তু সেদিন তারি কাছে যে একটা বিষম ট্রাজেডির অভিনয় হয়ে গেল, তা তার আজো মনে আছে . . .

পথের আলো একবার দপ্‌ দপ্‌ ক'রে উঠল।

ক্রমে সুকৃতের ছুটি ফুরিয়ে এল, সে আবার চ'লে গেল। শোভনার অনেক কথাই জিজ্ঞাসা কর্‌বার ছিল সুকৃৎ-দা'র কাছে, একটাও জিজ্ঞাসা করা হয়ে উঠ্‌ল না কিন্তু। যতবারই সে চেষ্টা করেচে, ততবারই সে অনুভব করেচে, তাদের মধ্যে কেমন ক'রে না জানি একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হয়ে গেছে, সে জন্যে আর আগের মতো মনের আদান-প্রদান চল্‌তে পারে না।

এবার চ'লে যাওয়ার পর সুকৃতের চিঠিগুলোও আর ঠিক নিয়মিতভাবে আস্‌ত না, যা আস্‌ত, তাও শোভনার মা'র নামে। এইটাই আরো তাদের মধ্যেকার দূরত্বের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাকে ব্যথা দিত। একদিন সে খুব অভিমান দেখিয়ে সুকৃৎ-দা'র কাছে চিঠি লিখে পাঠালে ; তাতে সুকৃৎ তাকে যথেষ্ট সান্ত্বনা দিয়ে এবং পরিহাস ক'রে জবাব দিল বটে, কিন্তু তারপর থেকে আবার চিঠি আস্‌তে সুরু হ'ল তার মা'র নামে, তার' নামে নয়।

এদিকে তার বিয়ে সম্বন্ধে পাকাপাকি কথা হতে সুরু হল, এমন কি সময়ে সময়ে শোভনার মা'কে বল্‌তে শোনা যেত, আর তো দেরী করা চলে না। . . .

তবু যতদূর সম্ভব তাঁরা দেরী কর্‌ছিলেন।

কি একটা অব্যক্ত বেদনা শোভনার মনে থেকে-থেকে জেগে উঠ্‌ত, যার একমাত্র সাক্ষী আছে এই পথের আলো। সহসা সে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ল। বাপ-মা হয় তো ভব্‌লেন, এ ভালোই ; কিন্তু দীর্ঘ সাঁঝের বেলা তার কাছে যে ক্রমে কি বেদনাদায়ক হয়ে উঠ্‌ল, তা আলোই জানে . . .

বিয়ে তার হয়ে গেল। বিয়ের সময় সুকৃত কলেজ-কামাই ক'রে চ'লে এল, আবার চ'লে গেল বিয়ের শেষে।

সেই থেকে এ-বাড়ীর ভাঙন সুরু হল ; পথের আলো তখন থেকে সমস্ত ব্যাপারের নির্ব্বাক সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শোভনা যাওয়ার পর তার বাবা-মা'র সময় আর কাটতে চাইত না; এতদিন তাঁরা আপনার ঘরের ব্যাপারের মধ্যে এমন ক'রে নিজেদের আবদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন যে, বাইরের দিকে তাকাবার কোনো প্রয়োজনই বোধ হয় নি। কিন্তু যাদের নিয়ে তাঁরা এমন ক'রে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলেছিলেন, তাদের যখন কেউই কাছে রইল না,তখন বিষম শূন্যতা একটা বোঝার মতো তাঁদের উপর চেপে বস্‌ল।

পরীক্ষার পর সুহৃৎ বাড়ী এল; কিন্তু বাড়ীর যে আকর্ষণ তাকে এখানকার বন্ধু-মহলে অমিশুকতার অখ্যাতি দিয়েছিল, সে আকর্ষণ যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। যে গৃহে এককালে তার সমস্ত আনন্দ কেন্দ্রীভূত ছিল, সেখানে আর আনন্দের সন্ধানই মেলে না যে!

একদিন সে শোভনার মা'কে বল্‌লে, আমার আর এখানে ভালো লাগ্‌চে না মাসি-মা, শোভনাকে শ্বশুর-বাড়ী থেকে পাঠাবে না?

এই কথাটা অনেকদিন থেকেই তার মনে জাগ্‌ছিল, কিন্তু আসল ভালো-না-লাগার কারণ সে এতদিন কিছুতেই মুখ ফুটে বল্‌তে পারে নি। ব'লে ফেলে সে ভারী আরাম বোধ কর্‌লে।

মাসি-মা বল্লেন, না বাবা, তারা বলেচে এখন পাঠাবে না। তা তুই এখুনি যাবি কি? পরীক্ষার খাটুনিতে তোর শরীরে কি আর আছে কিছু?

একজনের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্নেহ কোমল হৃদয় যেন আর এক স্নেহাস্পদের উপর নিজের সমস্ত রুদ্ধ স্নেহধারা বর্ষণ ক'রে তৃপ্তি পেতে চাইছিল।

সুহৃৎ বুঝ্‌লে; তাই সে র'য়ে গেল।

এই রকম ভাবে দিন কাটানো যখন ক্রমে সহজ হয়ে আস্‌ছিল, তখন সেই সদ্য-স্থাপিত শৃঙ্খলা সমস্ত বিপর্য্যস্ত ক'রে দিলে একখানা টেলিগ্রাম এসে। শোভনার অসুখ, খুব বেশী . . .

শোভনার বাবা অতিমাত্র ব্যাকুল হয়ে মেয়েকে দেখ্‌তে চ'লে গেলেন; সুহৃৎকে ব'লে গেলেন, তোমার মাসি-মাকে দেখো বাবা! আমি গিয়েই টেলিগ্রাম কর্‌ব কেমন থাকে . . .

টেলিগ্রাম তাঁকে করতে হল না; পরের দিনই তিনি ফিরে এলেন। সব শেষ হয়ে গেছে।

সেই দিন রাত দুপুরে সুহৃৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এল; পাগলের মতো তার চাহনি। খানিকক্ষণ সে শূন্য-দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পথের দিকে। পথের আলো

যতখানি সম্ভব তার আলোক বিস্তার ক'রে দেখ্‌লে, সে খানিকবাদে বাড়ীর পিছন দিগের দীর্ঘ ঘাসবনের অন্তরালে অন্ধকারে কোথায় চলে গেল . . .

তার পরদিন শোভনার বাবা-মাও বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন, আর ফিরেন নি।

কতদিন হয়ে গেছে। এখন বাড়ীর এই অবস্থা।

পথের আলো কেঁপে-কেঁপে উঠ্‌ল,—হাওয়ায় ?

— —

...সব জিনিষ পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টি ভিক্ষা নহেন, যদি তাঁকে পাই ত' আমিই তাঁকে পাইব নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।

—শ্রীবিলাস।

নিবেদন

আগামী ফাল্গুন সংখ্যা হইতে কল্লোলে মনীষী রমঁ্যা রলাঁর সুপ্রসিদ্ধ "জঁা ক্রিস্‌তোফ্‌" সমগ্র উপন্যাসখানি শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ ও শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র নাগ মহাশয়দ্বয়ের সাহায্যে মূল ফরাসী হইতে অনূদিত হইয়া ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।

ইংরাজী ১৯২১ হইতে ১৯২৩ সন পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয় পৃথিবীর একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল সাধক, ফরাসী ঔপন্যাসিক ও সঙ্গীত-শিল্প-সমালোচক মঁসিও রলঁ্যার সহিত একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কাটাইয়াছেন।

১৯২২ সনে রমঁ্যা রলঁ্যা, ইংলণ্ডের বার্ট্রাণ্ড রাসেল্‌, জারমানীর হার্‌মন্‌ হেসে প্রভৃতির মিলনস্থান সুইটজারল্যাণ্ড-এর লুগালো কংগ্রেস-এ কালিদাস নাগ India and Internationalism সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এই সূত্রে তিনি মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে যাহা কিছু উল্লেখ করিয়া ছিলেন তাহাতেই রলাঁ প্রভৃতির ভারতবর্ষ ও গান্ধী সম্বন্ধে আরও বিশেষ ভাবে জানিবার আগ্রহ হয়। এই সময় হইতেই রলাঁ মহাশয়, 'মহাত্মা গান্ধী' পুস্তকখানির প্রণয়ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং এই পুস্তকের ভূমিকা-লিপিতে কালিদাস নাগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন— 'He has guided my faultering steps in the forest of Hindoo thoughts.'

তাহার পর ১৯২৩ সনে ইনি Prague কংগ্রেসে আরও কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স-এ যাতায়াত ও রলাঁর সহিত ঘনিষ্ঠতা হইবার সঙ্গে সঙ্গে রঁলাঁর একমাত্র বন্ধু ও সহোদরা মাদাম রলাঁ বাংলাভাষা শিখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হন। বাংলা শিক্ষা ও বাংলার সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার মধ্য দিয়া কোন বাংলা রচনার ফরাসী ভাষায় অনুবাদ হইতে পারে কি না এ বিষয়ে রলাঁ ও তাঁহার ভগিনী চিন্তা করিতে থাকেন ও কালিদাস নাগকে এ বিষয়ে চেষ্টা

করিয়া দেখিতে অনুরোধ করেন। তাহারই ফলে ফরাসীর আধুনিক বিখ্যাত কবি ও রঁলার বন্ধু—P. Jouve মহাশয়ের সহিত একযোগে ইনি, রবীন্দ্রনাথের "বলাকা" ফরাসীভাষায় অনুবাদ করিয়া 'Cygne' নামে প্রকাশিত করেন।

এই কয় বৎসরের বন্ধুত্ব ও সাহচর্য্যের ভিতর দিয়া রঁলা ও কালিদাসবাবুর মধ্যে যে আত্মীয়তার সৃষ্টি হয় তাহার ফলে তিনি তাঁহার রচিত সমগ্র রচনার বঙ্গানুবাদ করিবার অনুমতি ও স্বত্ব কালিদাস নাগকে দান করিয়াছেন।

'জাঁ ক্রিস্‌তোফ্' দশ খণ্ডে সমাপ্ত। বংলা-ভাষায় উপন্যাস বলিলে সাধারণে যাহা বুঝে এই উপন্যাসখানি সেই জাতীয় নয়। সুদীর্ঘ দশ বৎসর কাল ধরিয়া রঁলা এই গ্রন্থখানি লইয়া অবিশ্রান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছেন। গতানুগতিক ভাবে প্লট্ বজায় রাখিয়া চলিবার প্রয়াস তিনি করেন নাই। 'মানুষ' এবং তাহার পারিপার্শ্বিক 'অবস্থাকে' যে-চোখ দিয়া দেখিয়াছেন, দুঃখের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা, দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি, অত্যাচারের নির্ভীক প্রতিবাদ এবং জাতীয় সমস্ত গোঁড়ামীর উপর যে তীব্র কষাঘাত করিয়াছেন, তাহা জগতের অন্য কোন সাহিত্যে অত্যন্ত দুর্লভ। ভাষার খেলা, চমকপ্রদ বা লোমহর্ষণ ঘটনাবলীর সমাবেশ প্রাকৃতির ভিতর দিয়া পাঠকের মনে বিস্ময় আনিয়া দিবার প্রয়াস ইহাতে নাই। পাঠক আপনি মুগ্ধ হয় তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া। তাঁহার দৃষ্টির ভিতর দিয়া মানুষ নূতন করিয়া জগৎকে দেখিতে শিখে।

উপন্যাসখানি ফরাসী ভাষায় লিখিত, ইহার অনুবাদে হয় ত' অনেক ত্রুটি থাকিয়া যাইবে, কারণ দুই ভাষার প্রকাশ-ভঙ্গিমা সব সময় এক হয় না; তবে মনে হয়, এই অনুবাদে মূল গ্রন্থের মর্য্যাদা নষ্ট হইবে না, কারণ ডাঃ কালিদাস নাগ ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত, এবং যাহাতে এই প্রয়াস সফল হয় তাহার জন্য তিনি ও শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র নাগ মহাশয় বিশেষ ভাবে যত্ন লইতেছেন।

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ কর্ত্তৃক ১০।২ পটুয়াটোলা লেন হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় দ্বারা "বাণীপ্রেস" ৩৩-এ মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

কল্লোল পাবলিশিং হাউস্

পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তকের এজেন্ট

২৭নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রবীন্দ্র-জন্মতিথি—রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা হইতে শ্রীসুনীতি দেবী সঙ্কলিত। বাংলা ভাষায় প্রথম জন্মতিথি-পুস্তক। মূল্য ২৷৽

শিবনাথ—সুনীতি দেবী প্রণীত। সাধু শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন-লিপি, ছেলে-মেয়েদের উপযোগী করিয়া লেখা। মূল্য ৷৽ আনা।

উতঙ্ক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ প্রণীত—পৌরাণিক গল্প হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদিগের অভিনয়ের ও পাঠের উপযোগী করিয়া লেখা কাব্যগ্রন্থ। মূল্য ৷৽ আনা।

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ প্রণীত

রূপ-রেখা—(গল্প সমষ্টি) মূল্য ১৲ একটাকা।

ঝড়ের দোলা—শ্রীসুনীতি দেবী, শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ, শ্রীমণীন্দ্র-লাল বসু, শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ এই চারিজন সুলেখকের লিখিত চারিটি গল্প, মূল্য ৸৹ আনা।

শৈলজা মুখোপাধ্যায় প্রণীত

হাসি—উপন্যাস (বাঁধাই) ১৷৹

বাংলার মেয়ে—২৲ (কাপড়ে বাঁধাই)

রাঙা শাড়ী—১৷৹ (কাপড়ে বাঁধাই)

লক্ষ্মী—উপন্যাস (বাঁধাই) ৸৹

নাটমন্দির—**কবি সুবোধ রায়ের** লেখা কয়টি কথানাট্য। স্কুলে বা ক্লাবে সহজে অভিনয় করিবার মত ও সময়োপযোগী লেখা। সুন্দর প্রচ্ছদ-পট ও বাঁধাই। দাম ১৲

শ্রীউমা গুপ্ত প্রণীত

ঘুমের আগে—ছেলে-মেয়েদের গল্প ও ছড়ার বই, মূল্য ।৵৹

মিলনের পথে—শ্রীললিতকুমার দে প্রণীত। মূল্য চার আনা মাত্র।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ন্যায়রত্নের নিয়তি—(উপন্যাস) মূল্য ১৷৹

কল্লোলের নিয়মাবলী

মূল্য—

কল্লোলের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৩৷৷০ টাকা প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। **নমুনার মূল্য ও ।০ আনা।** বৈ " হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত কল্লোলের বৎসর গণনা করা হয়। কেহ বৎসরের মধ্যে, গ্রাহক হইলে, তাঁহাকেও বৈশাখ হইতে কাগজ লইতে হয়। মূল্যাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়। ভিঃ পিতে কাগজ পাঠাইতে অনেক অসুবিধা. সুতরাং আগে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হইলে, আমাদের ও গ্রাহকদের সকলেরই সুবিধা।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা--

কল্লোল প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। সুতরাং কোনও মাসের কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাকবিভাগের উত্তরসহ সেই মাসের ১৪ই তারিখের মধ্যে আমাদের নিকট অপ্রাপ্তি-সংবাদ পৌঁছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর—

রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

রচনা—

প্রবন্ধ খুব বড় না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। টিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা গল্প কবিতা ফেরত দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোনও উত্তর দিতে অসমর্থ। ফেরত রচনাদি লেখকদিগের নিকট পৌঁছান সম্বন্ধে আমরা দায়ী নহি।

বিজ্ঞাপন—

কোনও মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়। সকল প্রকার বিজ্ঞাপনই আমরা ছাপিতে পারিব এরূপ অঙ্গীকার করিতে অসমর্থ। বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্লক ফেরৎ লইবেন। নচেত হারাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ব্লক কোন প্রকারে ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নহি। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিজ্ঞাপনের হারের জন্য সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিতে হয়।

Published by Sj. Dinesh Ranjan Das, 27, Cornwallish Street, Calcutta.